এবার কান্ড কেদারনাথে (গল্প)

(১৯৮৪)

ফেলুদা – সত্যজিত রায়

০১. কী ভাবছেন ফেলুবাবু

কী ভাবছেন, ফেলুবাবু?

প্রশ্নটা করলেন রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ু। আমরা তিনজনে রবিবারের সকালে আমাদের বালিগঞ্জের বৈঠকখানায় বসে আছি, লালমোহনবাবু যথারীতি তার গড়পারের বাড়ি থেকে চলে এসেছেন গল্পগুজবের জন্য। কিছুক্ষণ হল এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, কিন্তু এখন গনগনে রোদ। রবিবার লোডশেডিং নেই বলে আমাদের পাখাটা খুব দাপটের সঙ্গে ঘুরছে।

ফেলুদা বলল, ভাবছি আপনার সদ্যপ্রকাশিত উপন্যাসটার কথা।

পয়লা বৈশাখ জটায়ুর অতলান্তিক আতঙ্ক বেরিয়েছে, আর আজ পাঁচই বৈশাখের মধ্যেই নাকি সাড়ে চার হাজার কপি বিক্রি হয়ে গেছে।

লালমোহনবাবু বললেন, ও বইতে যে আপনার মতো লোকের ভাবনার খোরাক ছিল, তা তো জানতুম না মশাই।

ঠিক সে রকম ভাবনা নয়।

তবে?

ভাবছিলাম। আপনার গল্প যতই গাঁজাখুরি হোক না কেন, স্রেফ মশলা আর পরিপাকের জোরে শুধু যে উতরে যায় তা নয়, রীতিমতো উপাদেয় হয়।

লালমোহনবাবু গদগদ ভাব করে কিছু বলার আগেই ফেলুদা বলল, তাই ভাবছিলাম আপনার পূর্বপুরুষদের মধ্যে কোনও গল্প লিখিয়ে-টিখিয়ে ছিলেন কি না।

সত্যি বলতে কী, আমরা লালমোহনবাবুর পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানি না। উনি বিয়ে করেননি এবং ওঁর বাপ-মা আগেই মারা গেছেন সেটা জানি, কিন্তু তার বেশি উনিও বলেননি, আর আমরাও কিছু জিজ্ঞেস করিনি।

লালমোহনবাবু বললেন, পাঁচ-সাত পুরুষ। আগের কথা তো আর বিশেষ জানা যায় না, তাঁদের মধ্যে হয়তো কোনও কথক ঠাকুর-টাকুর থেকে থাকতে পারেন। তবে গত দু-তিন জেনারেশনের মধ্যে ছিল না সেটা বলতে পারি।

আপনার বাবার আর ভাই ছিল না?

থ্রি ব্রাদার্স। উনি ছিলেন মিড্‌ল। জ্যাঠা মোহিনীমোহন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন। ছেলেবেলায় আরনিক রাসটিকস বেলাডোনা পালসেটিলা যে কত খেয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার ললিতমোহন ছিলেন পেপার মার্চেন্ট। এল এম গাঙ্গুলী অ্যান্ড সন্যসের দোকান এই সেদিন অবধি ছিল। ভাল ব্যবসা ছিল। গড়পারের বাড়িটা

এল-এমই তৈরি করেন। ঠাকুরদাদা, বাবা দুজনেই ব্যবসায় যোগ দেন। বাবা যদিন বেঁচে ছিলেন। তিদিন ব্যবসা চালান। ফিফটি-টু-তে চলে গেলেন। তার পর যা হয়। আর কী। এল এম গাঙ্গুলী অ্যান্ড সনস-এর নামটা ব্যবহার হয়েছিল কিছু দিন, কিন্তু মালিক বদল হয়ে গেছিল।

আপনার ছোটকাকা? তিনি ব্যবসায় যোগ দেননি?

নো স্যার। ছোটকাকা দুর্গমোহনকে দেখি আমার জন্মের অনেক পরে। আমার জন্ম থার্টি সিক্সে। দুগামোহন টোয়েন্টি নাইনে সন্ত্রাসবাদীদের দলে যোগ দিয়ে খুলনার অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার টার্নবুল সাহেবকে গুলি মেরে তাঁর থুতনি উড়িয়ে দেন।

তার পর?

তারপর হাওয়া। বেপাত্তা। পুলিশ ধরতে পারেনি ছাটকাকাকে। আমরা ধারণা আমার অ্যাডভেঞ্চার প্রীতিটা ছোটকাকার কাছ থেকেই পাওয়া।

উনি আর আসেননি?

এসেছিলেন। একবার। স্বাধীনতার পর ফর্টি নাইনে। তখন আমি থার্ড ক্লাসে পড়ি। সেই প্রথম আর সেই শেষ দেখা ছোটকাকার সঙ্গে। তবে যাঁকে দেখলাম, তিনি সেই অগ্নিযুগের ছাটকাকা দুগামোহন গাঙ্গুলী নন। কমপ্লিট চেঞ্জ। কোথায় সন্ত্রাস, কোথায় পিস্তল। একেবারে নিরীহ, সাত্ত্বিক পুরুষ। মাসখানেক ছিলেন, তার পর আবার চলে যান।

কোথায়?

যদ্দুর মনে পড়ে কোনও জঙ্গলে কাঠের ব্যবসা করতে যান।

বিয়ে করেননি?

নাঃ।

কিন্তু আপনার আপনি বা জ্যাঠতুতো ভাইবোন আছে নিশ্চয়ই।

আপনি বোন একটি আছেন, দিদি। স্বামী রেলওয়েতে চাকরি করেন; ধানবাদে পোস্টেড। জ্যাঠার ছেলে নেই, তিন মেয়ে, তিনজনের স্বামীই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। বিজয়া দশমীতে একটি করে পোস্টকার্ড—ব্যস। আসলে রক্তের সম্পর্কটা কিছুই নয়, ফেলুবাবু। এই যে আপনার আর তাপেশের সঙ্গে আমার ইয়ে, তার সঙ্গে কি ব্লাড রিলেশনের কোনও—?

লালমোহনবাবুর কথা থামাতে হল, কারণ দরজায় টাকা পড়েছে। এটা যাকে বলে প্রত্যাশিত, কারণ টেলিফোনে অ্যাপেয়েন্টমেন্ট করা ছিল। সাড়ে নটার জন্য, এখন বেজেছে ন'টা তেত্রিশ।

ভদ্রলোকের নামটা জানা ছিল টেলিফোনে—উমাশঙ্কর পুরী—এবার চেহারাটা দেখা গেল। মাঝারি হাইট, দোহারা গড়ন, পরনে ঘি রঙের হ্যান্ডলুমের সুট। দাড়ি-গোঁফ। কামানো। মাথার চুল কাঁচা-পাকা মেশানো, ডান দিকে সিঁথি। এই শেষের ব্যাপারটা দেখলেই কেন যেন আমার আসোয়াস্তি হয়; মনে হয় মুখটা যেন আয়নায় দেখছি। পুরুষদের মধ্যে শতকরা একজনের বেশি ডান দিকে সিঁথি করে কিনা সন্দেহ, যদিও কারণটা জিজ্ঞেস করলে বলতে পারব না।

আপনাকে খুব তাড়াহুড়ো করে চলে আসতে হয়েছে বলে মনে হচ্ছে? ফেলুদা মন্তব্য করল। আলাপ পর্বের পর ভদ্রলোক চেয়ারে বসতেই।

হ্যাঁ, তা— উমাশঙ্করের ভুরু কপালে উঠে গেল—কিন্তু সেটা আপনি জানলেন কী করে?

আপনার বাঁ হাতের সব নখই পরিষ্কার করে ক্লিপ দিয়ে কাটা, তার একটি নখ এখনও কোটের পকেটের ধারে লেগে আছে, অথচ ডান হাতে দুটো নখের পরে আর বাকিগুলো...

আর বলবেন না। বললেন মিঃ পুরী, ঠিক সেই সময় একটা ট্রাঙ্ক কল এসে গেল; কথা শেষ হতে দেখি, আপনার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় হয়ে গেছে।

যাক্ গে—এবার বলুন আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি।

মিঃ পুরী গভীর হয়ে নিজেকে সংযত করে নিলেন। তার পর বললেন, মিঃ মিটার, আমি থাকি ভারতবর্ষের আরেক প্রান্তে। আপনার নাম আমি শুনেছি। ভগওয়ানগড়ের রাজার কাছ থেকে। শুধু নাম নয়, প্রশংসা। তাই আমি আপনার কাছে এসেছি।

আমি তাতে গর্ব বোধ করছি।

এখন কথা হচ্ছে কি— মিঃ পুরী থামলেন। তাঁর মধ্যে একটা ইতস্তত ভাব লক্ষ করছিলাম। তিনি আবার বললেন, ব্যাপারটা হচ্ছে কি—একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে; সেইটে যাতে না ঘটে তাই আমি আপনার সাহায্য চাইছি। সেটা পাওয়া যাবে কি?

ফেলুদা বলল, আপনি কী ঘটনা বা দুর্ঘটনার কথা বলছেন, সেটা না জানা পর্যন্ত আমি মতামত দিতে পারছি না।

শ্রীনাথ এই সময় চা-চানাচুর-বিস্কুট এনে রাখাতে কথায় একটু বিরতি পড়ল। তারপর মিঃ পুরী একটা বিস্কুট তুলে নিয়ে বললেন, আপনি রূপনারায়ণগড় স্টেটের নাম শুনেছেন?

নামটা চেনা-চেনা লাগছে, বলল ফেলুদা, উত্তরপ্রদেশে কি?

ঠিকই বলেছেন, বললেন মিঃ পুরী।আলিগড় থেকে ৯০ কিলোমিটার পশ্চিমে। আমি যখনকার কথা বলতে যাচ্ছি সেটা আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে। তখন রাজা ছিলেন চন্দ্রদেও সিং। আমি ছিলাম এস্টেটের ম্যানেজার। ভারত স্বাধীন হয়ে গেলেও তখনও এসব নেটিভ স্টেটের উপর তত চাপ পড়েনি; রাজার রাজাই ছিলেন। চন্দ্রদেও-এর বছর চুয়ান্ন বয়স, কিন্তু তখনও সিংহের মতো চেহারা। শিকার করেন, টেনিস খেলেন, পোলো খেলেন, প্রৌঢ়ত্বের কোনও লক্ষণ নেই। একটি ব্যারাম তাঁকে মাঝে মাঝে বিব্রত করত, কিন্তু সেটা যে হঠাৎ এমন আকার ধারণ করবে, সেটা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। হাঁপানি। সে যে কী হাঁপানি সে আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। একটা জলজ্যান্ত জোয়ান মানুষকে ছ’ মাসের মধ্যে কঙ্কালে পরিণত হতে এই প্রথম দেখলাম। কোনও ওষুধে কোনও কাজ দিল না। হয়তো দু দিন দেয়, আবার যেই কে সেই!

সেই সময় খবর এল, হরিদ্বারে নাকি এক ভদ্রলোক থাকেন, নাম ভবানী উপাধ্যায়, তিনি নাকি হাঁপানির অব্যর্থ ওষুধ জানেন। বহু রুগি তাঁর ওষুধে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করেছে।

আমি নিজেই চলে গেলাম হরিদ্বার। ঠিকানা জানা ছিল না ভদ্রলোকের, কিন্তু খোঁজ পেতে অসুবিধা হল না, কারণ ওঁকে অনেকেই চেনে। সাদাসিধা মানুষ, ছোট্ট একটা বাড়িতে থাকেন, আমাকে যথেষ্ট খাতির করে তাঁর তক্তপোশে বসলেন। তার পর সব শুনেটুনে বললেন, আমি যাব আপনার সঙ্গে, রাজাকে ওষুধ দেব; সারবার হলে দশ দিনের মধ্যে সারবে, না হলে নয়। সেই দশ দিন আমি ওখানে থাকব। ওষুধে কাজ না দিলে আমি কোনও পয়সা নেব না।

বললে বিশ্বাস করবেন না। মিঃ মিটার, দশ দিন নয়, সাত দিন নয়, তিন দিনের মধ্যে রাজার হাঁপানি উধাও। এমন যে ঘটতে পারে সেটা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। উপাধ্যায় বললেন তাঁর ওষুধের দাম পঞ্চাশ টাকা। রাজাকে বলতে তিনি তো কথাটা কানেই তুললেন না। বললেন, আমি মরতে বসেছিলাম, উনি এসে আমাকে নতুন জীবন দান করলেন, আর তার দাম হল। কিনা পঞ্চাশ টাকা?

এখানে বলে রাখি যে রাজা চন্দ্রদেও মানুষটা একটু খামখেয়ালি ছিলেন। তা ছাড়া তাঁর শোক, তাঁর আনন্দ, তাঁর ক্রোধ, তাঁর দয়া-দক্ষিণ্য-সবই সাধারণ মানুষের চেয়ে মাত্রায় অনেকটা বেশি ছিল। পঞ্চাশ টাকার বদলে উনি উপাধ্যায়কে যেটা দিলেন, সেটা একটা মণিমুক্তাখচিত সোনার বালগোপাল। জিনিসটা আসলে একটা পেনডোন্ট বা লকেট-ল স্বায় ইঞ্চি তিনেক। তখনকার দিনে সেটার দাম পাঁচ-সাত লাখ টাকা।

একটু ফাঁক পেয়ে ফেলুদা প্রশ্ন করল, উপাধ্যায় নিলেন সেই লকেট?

সেই কথাই তো বলছি, বললেন উমাশঙ্কর পুরী। উপাধ্যায় বললেন, আমি সাদাসিধে। মানুষ, আমাকে এমন বিপাকে ফেলছেন কেন? এত দামি একটা জিনিস আমার কাছে থাকবে, সেটা লোকে আমার বলে বিশ্বাস করবে। কেন? সবাই ভাববে। আমি চুরি করেছি।

রাজা বললেন—কারুর তো জানার দরকার নেই। আমরা তো আর খবরটা ঢাকা পিটিয়ে জাহির করতে যাচ্ছি না। আর নেহাতই যদি কেউ জেনে ফেলে, তার জন্য আমি আমার নিজের সিলমোহর দিয়ে লিখে দিচ্ছি যে, এটা আমি তোমাকে পারিতোষিক হিসেবে দিলাম। এর পরে তো আর কারুর কিছু বলার নেই।

উপাধ্যায় বলল, তাই যদি হয়, তা হলে আমি মাথা পেতে নেবা আপনার এ পারিতোষিক।

ফেলুদা বলল, আপনি, রাজা, এবং উপাধ্যায়—এই তিনজন ছাড়া আর কেউ কি ঘটনাটা জানত?

আমি সত্যি কথা বলব, বললেন উমাশঙ্কর পুরী, রাজা নিজে যদি খেয়ালবশে কাউকে বলে থাকেন তো সে আমি জানি না; ব্যাপারটা জানত রাজা, রানি এবং দুই রাজকুমার-সূর্য ও পবন। বড় কুমার সূর্যয অতি চমৎকার ছেলে, রাজপরিবারে এমন দেখা যায় না। তার বয়স তখন বাইশ-তেইশ। ছোট কুমারের বয়স পনেরো। এ ছাড়া জানতাম আমি, আমার স্ত্রী আর আমার ছেলে দেবীশঙ্কর—তার বয়স তখন পাঁচ কি ছয়। ব্যস, আর কেউ না। আর এটাও আপনি খেয়াল করে দেখুন। মিঃ মিটার—এ খবর কিন্তু গত ত্রিশ বছরে কোনও কাগজে বেরোয়নি। আপনি তো সাংবাদিকদের জানেন; তারা এর গন্ধ পেলে কি ছেড়ে দিত?

সে কথা ঠিক, বলল ফেলুদা, ব্যাপারটার গোপনীয়তা রক্ষিত হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

যাই হাক, এবার আমি এগিয়ে আসছি। বর্তমানের দিকে। রাজা চন্দ্রদেও সিং বেঁচেছিলেন আর বছর বারো। তার পর সূর্যদেও রাজা হলেন। রাজা মানে, তখন তো আর রাজা কথাটা ব্যবহার করা চলে না; বলতে পারেন। উনিই হলেন কর্তা।

আপনি তখনও ম্যানেজার?

আজ্ঞে হ্যাঁ; এবং আমি প্রাণপণে চেষ্টা করছি। যাতে ব্যবসা ইত্যাদির সাহায্যে রূপনারায়ণগড়ের ভবিষ্যৎকে আরও মজবুত করা যায়। কিন্তু মুশকিল হয়েছে কী, সূর্যদেও-এর এসব দিকে কোনও উৎসাহ নেই। তার নেশা হচ্ছে বই। সে দিনের মধ্যে ষোলো ঘণ্টা তার লাইব্রেরিতে পড়ে থাকে। সেখানে আমার একার চেষ্টায় আমি কী করতে পারি? ফলে আর্থিক দিক দিয়ে স্টেটের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে আসতে থাকে।

আপনার নিজের ছেলেও তো তত দিনে বড় হয়েছে?

হ্যাঁ। দেবীকে অবশ্য আমি আগেই আলিগড়ে স্কুলে পাঠিয়ে দিই। সে আর রূপনারায়ণগড়ে ফেরেনি। দিল্লী গিয়ে নিজেই ব্যবসা শুরু করেছে।

আপনার কি ওই একই ছেলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। যাই হাক, আমার নিজের অনেকবার মনে হয়েছে যে ম্যানেজারি ছেড়ে দিয়ে আমার নিজের দেশ মোরাদাবাদে গিয়ে একটা কিছু করি, কিন্তু মায়া কাটাতে পারছিলাম না।

মিঃ পুরী এবার পকেট থেকে একটা চুরুট বার করে ধরিয়ে নিয়ে বললেন, এবার আমি আসল ঘটনায় আসছি; আপনার ধৈর্যচ্যুতি হয়ে থাকলে আমায় মাপ করবেন।

সাত দিন আগে, অর্থাৎ উনত্রিশে এপ্রিল, শনিবার রূপনারায়ণগড়ের ছোট্টকুমার পবনদেও সিং হঠাৎ আমার কাছে এসে হাজির হন। তার প্রথম কথাই হল, আমার বাবার হাঁপানি যিনি সারিয়েছিলেন, তাঁর নাম ও তাঁর হরিদ্বারের ঠিকানাটা আমার চাই।

স্বভাবতই আমি প্রথমে জিজ্ঞেস করলাম, কারুর কোনও অসুখ করেছে কি না। পবন বলল, না, তা নয়; সে একটা টেলিভিশনের ছবি করছে, তার জন্য তার এই ভদ্রলোককে দরকার।

পবন যে ক্যামেরা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে সেটা আমি জানতাম, কিন্তু সে যে টেলিভিশন নিয়ে মেতে উঠেছে, সে খবর জানতাম না। আমি বললাম, তুমি কি তোমার ছবিতে সে ভদ্রলোককে দেখাতে চাও? সে বললে, অবশ্যই। শুধু তাই না। বাবা তাকে যে লকেটটা দিয়েছিলেন সেটাও দেখাব। একটা অসুখ সারিয়ে এ রকম বিকশিস আর কেউ কোথাও পেয়েছে বলে আমার মনে হয় না।

তখন আমার পবনকে বলতেই হল যে, উপাধ্যায়। তাঁর এই পারিতোষিকের ব্যাপারটা একেবারেই প্রচার করতে চাননি। পবন বলল, ত্রিশ বছর আগে একটা লোক যে কথা বলেছে, আজও যে সে তাই বলবে এমন কোনও কথা নেই। সমস্ত পৃথিবীর কাছে নানা রকম তথ্য পরিবেশন করা টেলিভিশনের একটা প্রধান কাজ। আপনি আমাকে নাম ঠিকানা দিন; ওঁকে রাজি করবার ভার আমার।

কী আর করি; বাধ্য হয়ে উপাধ্যায়ের নাম ঠিকানা দিয়ে দিলাম; সে ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেল।

উপাধ্যায়ের বয়স এখন আন্দাজ কত হবে? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

তা সত্তর-বাহাত্তর তো হবেই। রূপনারায়ণগড়ে যখন এসেছিল, তখন তার যৌবন পেরিয়ে গেছে।

ফেলুদা উমাশঙ্করের দিকে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলল, আপনি কি শুধু এই ব্যাপারটার গোপনীয়তা রক্ষা হবে না বলেই চিন্তিত হচ্ছেন?

মিঃ পুরী মাথা নাড়লেন।

না মিঃ মিটার। আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন। শুধু যদি তাই হত, তা হলে আমি আপনার কাছে আসতাম না। আমার ভয় হচ্ছে ওই লকেটটাকে নিয়ে। পবনের নতুন শখ হয়েছে। টেলিভিশনের ছবি তোলার। আপনি নিশ্চয় জানেন যে কাজটা খরচসাপেক্ষ। পবনের নিজের কোনও অর্থ সংগ্রহের রাস্তা আছে কিনা জানি না, কিন্তু এটা জানি যে, ওই একটি লকেট ওর সমস্ত অর্থসমস্যা দূর করে দিতে পারে।

কিন্তু ওই লকেটটি হাত করতে হলে তো তাকে অসদুপায় অবলম্বন করতে হতে পারে।

তা তো বটেই।

পবনদেও ছেলে কেমন?

সে বাপের কিছু দাষ-গুণ দুটোই পেয়েছে। পবনের মধ্যেও একটা বেপরোয়া দিক আছে। ভাল খেলোয়াড়। ছবি ভাল তোলে। আবার জুয়ার নেশাও আছে। অথচ তার দরাজ মনের পরিচয় পেয়েছি। ওকে চেনা ভারী শক্ত। যেমন ছিল ওর বাপকে।

তা হলে আপনি আমার কাছে কী চাইছেন?

আমি চাইছি, আপনি দেখুন যাতে এই অসদুপায়টি অবলম্বন না করা হয়।

পবনদেও কি হরিদ্বার যাচ্ছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে তাঁর যেতে একটু দেরি হবে—অন্তত পাঁচ-সাত দিন, কারণ এখন উনি প্যালেসের ছবি তুলছেন।

আমাদেরও যেতে গেলে সময় লাগবে, কারণ তার আগে তো ট্রেনে বুকিং পাওয়া যাবে না।

তা বটে।

কিন্তু ধরুন যদি আমি কেসটা নিই, আমি আপনাদের ছাট কুমারকে চিনছি কী করে?

সে ব্যবস্থাও আমি করে এনেছি। দিল্লির একটি সাপ্তাহিক কাগজে কুমারের এই রঙিন ছবিটা বেরিয়েছিল গত মাসে। একটা বিলিয়ার্ড চ্যামপিয়নশিপে জিতেছিল। এটা আপনি রাখুন। আর ইয়ে, আপনাকে আগাম কিছু...?

আমি হাজার টাকা অ্যাডভান্স নিই, বলল ফেলুদা।কেস সফল না হলেও সেটা ফেরত দিই না, কারণ সফল না হওয়াটা অনেক সময় গোয়েন্দার অক্ষমতার উপর নির্ভর করে না। সফল হলে আমি আরও এক হাজার টাকা নিই।

বেশ। আপনাকে এখনই কিছু বলতে হবে না। আমি পার্ক হোটেলে আছি। আপনি কী স্থির করেন, বিকেল চারটে নাগাত ফোন করে জানিয়ে দেবেন। হ্যাঁ হলে আমি নিজে এসে আপনাকে আগাম টাকা দিয়ে যাব।

০২. মাইক্রোক্যাসেট রেকর্ডার

ফেলুদা যে কেসটা নেবে, সেটা আমি আগে থেকেই জানতাম। আজকাল আমরা মক্কেলের কথাবার্তা হংকং থেকে কেনা একটা মাইক্রোক্যাসেট রেকর্ডারে তুলে রাখি। মিঃ পুরীর বেলাতে ওঁর অনুমতি নিয়ে তাই করেছিলাম। ফেলুদা দুপুরে সেই সব কথাবার্তা প্লে ব্যাক করে খুব মন দিয়ে শুনে বলল, কেসটা নেবার সপক্ষে দুটো যুক্তি রয়েছে; একটা হল এর অভিনবত্ব, আর দুই হল-গোয়েন্দাগিরির প্রথম যুগে দেখা হরিদ্বার-হৃষীকেশটা আর একবার দেখার লোভ।

বাদশাহী আংটির ক্লাইম্যাকস্-টা যে হরিদ্বারেই শুরু হয়েছিল, সেটা আমিও কোনও দিন ভুলব না।

পার্ক হোটেলে টেলিফোন করে কেসটা নিচ্ছে বলে ফেলুদা মিঃ পুরীকে জানিয়ে দিয়েছিল। আর মিঃ পুরীও আধা ঘণ্টার মধ্যে এসে আগাম টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুষ্পক ট্র্যাভেলাসে ফোন করে ফেলুদ। ডুন এক্সপ্রেসে আমাদের বুকিং-এর জন্য জানিয়ে দিয়েছিল। হঠাৎ দুদিন পরে এক অদ্ভুত ব্যাপার। রূপনারায়ণগড় থেকে মিঃ পুরীর এক টেলিগ্রাম এসে হাজির–

রিকেগয়েস্ট ড্রপ কেস। লেটার ফলোজ।

ড্রপ কেস! এ তো তাজ্জব ব্যাপার। এমন তো আমাদের অভিজ্ঞতায় কখনও হয়নি।

মিঃ পুরীর চিঠিও এসে গেল দু দিন পরে। মোদ্দা কথা হচ্ছে-ছোটকুমার মত পালটেছে। সে হরিদ্বার-হৃষীকেশ গিয়ে ছবি তুলবে, তাতে উপাধ্যায় থাকবেন, কিন্তু তাতে শুধু দেখানো হবে তিনি কীভাবে নিজের তৈরি ওষুধ দিয়ে স্থানীয় লোকের চিকিৎসা করেন। রূপনারায়ণগড়ের রাজার চিকিৎসাও যে উপাধ্যায় করেছিলেন, সেটা ছবিতে বলা হবে, কিন্তু মহামূল্য পারিতোষিকের কথাটা বলা হবে না।

ফেলুদা টেলিগ্রামে উত্তর দিল—ড্রপিং কেস, বাট গোইং অ্যাজ পিলগ্রিমস। অর্থাৎ কেস বাতিল করছি, কিন্তু তীর্থযাত্রী হিসেবে যাচ্ছি।

আমি জানি, ফেলুদা ও কথা লিখলেও ও নিজের গরজেই চোখ-কান খোলা রাখবে, আর তদন্তের কোনও কারণ দেখলে তদন্ত করবে! সত্যি বলতে কী, ভবানী উপাধ্যায় আর ছোটকুমার পবনদেও সিং-এই দুটি লোককেই আমার খুব ইণ্টারেস্টিং বলে মনে হচ্ছিল।

আমরা তিনজন এখন ডুন এক্সপ্রেসের একটা থ্রি টিয়ার কম্পার্টমেন্টে বসে আছি! ফৈজাবাদ স্টেশনে মিনিট দু-এক হল গাড়ি থেমেছে, আমরা ভাঁড়ের চা কিনে খাচ্ছি।

আপনি যে বলছিলেন। হরিদ্বার গেসলেন, সেটা কবে? ফেলুদা তার সামনের সিটে বসা লালমোহনবাবুকে জিজ্ঞেস করল।

আমার ঠাকুরদা একবার সপরিবারে তীর্থভ্রমণে যান, বললেন লালমোহনবাবু, ইনকুডিং হরিদ্বার; তখন আমার বয়সে দেড়; কাজেই নো মেমরি।

এবার অন্য দিক থেকে একটা প্রশ্ন এল।

আপনারা কি শুধু হরিদ্বারই যাচ্ছেন, না। ওখান থেকে এ দিকে ও দিকেও ঘুরবেন?

এ-প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবুর পাশে বসা এক বৃদ্ধ। মাথায় সামান চুল যা আছে তা সবই পাকা, কিন্তু চামড়া টান, দাঁত সব ওরিজিনাল, আর চোখের দুপাশে যে খাঁজগুলো রয়েছে, সেগুলো যেন হাসবার জন্য তৈরিই হয়ে আছে।

হরিদ্বারে একটু কাজ ছিল, বলল ফেলুদা। সেটা হয়ে গেলে পর.দেখা যাক–

কী বলছেন মশাই! বৃদ্ধের চোখ কপালে উঠে গেছে-অ্যাদাপূর এসে কেদার-বস্ত্রীটা দেখে যাবেন না? বন্দ্রীনাথ তো সোজা বাসে করেই যাওয়া যায়। কেদারের শেষের কাটা মাইল অবিশ্যি এখনও বাসা-রুটি হয়নি। তবে এও ঠিক যে কেদারের কাছে বস্ত্রী কিছুই নয়। যদি পারেন তো একবার কেদারটা ঘুরে আসবেন। শেষের হাঁটা পথটুকু আর– ফেলুদা আর আমার দিকে তাকিয়ে-আপনাদের বয়সে কী! আরি- লালমোহনবাবুর দিকে তাকিয়ে–এনার জন্য তো ডাণ্ডি আর টাটু ঘোড়াই আছে। টাটু ঘোড়ায় কখনও?

শেষের প্রশ্নটা অবিশ্যি লালমোহনবাবুকেই করা হল। লালমোহনবাবু হাতের ভাঁড়টায় একটা শেষ চুমুক দিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে গম্ভীরভাবে অন্য দিকে চেয়ে বললেন, আজ্ঞে না, তবে থর ডেজার্টে একবার উটের পিঠে চড়ে দৌড়ের অভিজ্ঞতা হয়েছে। সেটা আপনার হয়েছে কি?

বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন। —ত হয়নি। আমার চরবার ক্ষেত্র হল হিমালয়ের এই বিশেষ অংশ। তেইশবার এসেছি কেদার-বস্ত্রী। ভক্তি-টিক্তি আমার যে তেমন আছে তা নয়, তবে এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য থেকেই আমি সব আধ্যাত্মিক শক্তি আহরণ করি। কোনও বিগ্রহের দরকার হয় না।

ভদ্রলোকের নাম পরে জেনেছিলাম মাখনলাল মজুমদার। শুধু কেদার-বন্দ্রী নয়, যমুনেত্রী, গঙ্গোত্রী, গোমুখ, পঞ্চকেদার, বাসুর্কিতাল-এ সবও এঁর দেখা আছে। নেহাত একটা সংসার আছে, না হলে হিমালয়েই থেকে যেতেন। অবিশ্যি এটাও বললেন যে, আজকের বাস-ট্যাক্সিতে করে যাওয়া আর আগেকার দিনের পায়ে হেঁটে যাওয়া এক জিনিস নয়। বললেন, আজকাল তো আর কেউ পিলগ্রিম নয়, সব পিকনিকারস। তবে হ্যাঁ, গাড়ির রাস্তা তৈরি করে তো আর হিমালয়ের দৃশ্য পালটানো যায় না। নয়নাভিরাম বলতে যা বোঝায়, সে রকম দৃশ্য এখনও অফুরন্ত আছে।

ভোর ছটায় ডুন এক্সপ্রেস পৌঁছাল হরিদ্বার।

সেই বাদশাহী আংটির সময় যেমন দেখেছিলাম, পাণ্ডার উপদ্রবটা যেন তার চেয়ে একটু কম বলে মনে হল। স্টেশনেই একটা রেস্টোরান্টে চা-বিস্কুট খেয়ে নিলাম। উপাধ্যায়ের নাম এখানে অনেকেই জানে আন্দাজ করেই বোধহয় ফেলুদা রেস্টোরান্টের ম্যানেজারকে তাঁর হদিস জিজ্ঞেস করল।

উত্তর শুনে বেশ ভালরকম একটা হোঁচট খেলাম।

ভবানী উপাধ্যায় তিন-চার মাস হল হরিদ্বার ছেড়ে রুদ্রপ্রয়াগ চলে গেছেন।

তাঁর বিষয়ে আরও খবর কে দিতে পারে, বলতে পারেন? জিজ্ঞেস করল ফেলুদা। উত্তর এল-এখনকার খবর পেতে হলে রুদ্রপ্রয়াগ যেতে হবে, আর যদি আগেকার খবর চান। তো কান্তিভাই পণ্ডিতের কাছে যান। উনি ছিলেন উপাধ্যায়জীর বাড়িওয়ালা। তিনি সব খবর জানবেন।

তিনিও কি লক্ষ্মণ মহল্লাতেই থাকেন?

হ্যাঁ হ্যাঁ। পাশাপাশি বাড়িতে থাকতেন ওঁরা। সবাই ওঁকে চেনে ওখানে। জিজ্ঞেস করলেই বলে দেবে।

আমরা আর সময় নষ্ট না করে বিল চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

কান্তিভাই পণ্ডিতের বয়স ষাট-পয়ষট্টি, বেঁটেখাটো চোখাচাখা ফরসা চেহারা, খোঁচা খোঁচা গোঁফ, কপালে চন্দনের ফোঁটা আর চোখে বাইফোকাল চশমা। আমরা ভবানী উপাধ্যায়ের খোঁজ করছি জেনে উনি রীতিমতো অবাক হয়ে বললেন, কী ব্যাপার বলুন তো? আর একজন তো ওঁর খোঁজ করে গেলেন এই তিন-চার দিন আগে।

তাঁর চেহারা মনে আছে আপনার?

তা আছে বইকী।

দেখুন তো এই চেহারার সঙ্গে মেলে। কিনা।

ফেলুদা পকেট থেকে ছোটকুমার পবনদেও-এর ছবিটা বার করে দেখাল।

হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো সেই লোক, বললেন। কান্তিভাই পণ্ডিত। আমি রুদ্রপ্রয়াগের ঠিকানা দিয়ে দিলাম তাঁকে।

সে ঠিকানা অবিশ্যি আমরাও চাই, বলে ফেলুদা তার একটা কার্ড বার করে দিল মিঃ পণ্ডিতের হাতে।

কার্ডটা পাওয়ামাত্র মিঃ পণ্ডিতের হাবভাব একদম বদলে গেল। এতক্ষণ আমরা দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম, এবার আমাদের সকলকে চেয়ার, মোড়া আর তক্তপোশে ভাগাভাগি করে বসতে দেওয়া হল।

কেয়া, কুছ গড়বড় হুয়া মিঃ মিত্তর?

যত দূর জানি, এখনও হয়নি, বলল ফেলুদা। তবে হবার একটা সম্ভাবনা আছে। এবার আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই, মিঃ পণ্ডিত; আপনি সঠিক উত্তর দিতে পারলে খুব উপকার হবে।

আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট।

মিঃ উপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহে কি কোনও একটা মূল্যবান জিনিস ছিল?

মিঃ পণ্ডিত একটু হেসে বললেন, এ প্রশ্নটাও আমাকে দ্বিতীয়বার করা হচ্ছে। আমি মিঃ সিংকে যা বলেছি, আপনাকেও তাই বলছি। মিঃ উপাধ্যায়ের একটা থলি উনি আমার সিন্দুকে রাখতে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে যে কী ছিল, সেটা আমি কোনও দিন দেখিনি বা জিজ্ঞেসও করিনি।

সেটা উনি রুদ্রপ্রয়াগ নিয়ে গেছেন?

ইয়েস স্যার। অ্যান্ড অ্যানাদার থিং-আপনি ডিটেকটিভ, তাই এ খবর আমি আপনাকে বলছি, আপনার হয়তো কাজে লাগতে পারে-পাঁচ-ছে। মহিনে আগে দুজন লোক—তখনও মিঃ উপাধ্যায় ছিলেন। এখানে—একজন সিন্ধী কি মাড়োয়ারি হবে।-হি লুকড় এ রিচ ম্যান-অ্যান্ড অ্যানাদার ম্যান-দুজন উপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। অনেক কথা হচ্ছিল সেটা আমি বুঝতে পারছিলাম। এক ঘণ্টার উপর ছিল। তারা যাবার পর উপাধ্যায় একটা কথা আমাকে বলে-পণ্ডিতজী, আজ আমি একটি রিপুকে জয় করেছি। মিঃ সিংঘানিয়া আমাকে লোভের মধ্যে ফেলেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি সে লোভ কাটিয়ে উঠেছি।

আপনি উপাধ্যায়ের এই সম্পত্তির কথা আর কাউকে বলেননি?

দেখুন মিঃ মিত্তর, ওঁর যে একটা কিছু লুকোবার জিনিস আছে, সেটা অনেকেই জানত। আর সেই নিয়ে আড়ালে ঠাট্টাও করত। আমার আবার সন্ধ্যাবেলায় একটু নেশা করার অভ্যাস আছে, হয়তো কখনও কিছু বলে ফেলেছি। কিন্তু উপাধ্যায়জীকে সকলে এখানে এত ভক্তি করত যে, সিন্দুকে কী আছে সেই নিয়ে কেউ কোনও দিন মাথা ঘামায়নি।

এই যে রুদ্রপ্রয়াগ গেলেন তিনি, এর পিছনে কোনও কারণ আছে?

আমাকে বলেছিলেন, গঙ্গার ঘাটে ওঁর একজন সাধুর সঙ্গে আলাপ হয়। তাঁর সঙ্গে কথা বলে উপাধ্যায়ের মধ্যে একটা মানসিক চেঞ্জ আসে। আমার মনে হয়, চেঞ্জটা বেশ সিরিয়াস ছিল। কথা-টথা সব কমিয়ে দিয়েছিলেন। অনেক সময় চুপচাপ বসে ভাবতেন।

ওঁর ওষুধপত্তর কি উনি সঙ্গেই নিয়েছিলেন?

ওষুধ বলতে তো বেশি কিছু ছিল না; কয়েকটা বৈয়াম, কিছু শিকড়-বাকল, কিছু মলম, কিছু বড়ি—এই আর কী। এগুলো সবই উনি নিয়ে গিয়েছিলেন। তবে আমার নিজের ধারণা উনি ক্রমে পুরোপুরি সন্ন্যাসের দিকে চলে যাবেন।

উনি বিয়ে করেননি?

না। সংসারের প্রতি ওঁর কোনও টান ছিল না। যাবার দিন আমাকে বলে গেলেন-ভোগের রাস্তা, ত্যাগের রাস্তা, দুটোই আমার সামনে ছিল। আমি ত্যাগটাই বেছে নিলাম।

ভাল কথা বলল ফেলুদা, আপনি যে বললেন, ওঁর রুদ্রপ্রয়াগের ঠিকানা আপনি দিয়ে দিয়েছেন ওই ভদ্রলোকটিকে-আপনি ঠিকানা পেলেন কী করে?

কেন, উপাধ্যায় আমাকে পোস্টকার্ড লিখেছে সেখান থেকে।

সে পোস্টকার্ড আছে?

আছে বইকী।

মিঃ পণ্ডিত তাঁর পিছনের একটা তাকে রাখা বাক্সের ভিতর হাত ঢুকিয়ে একটা পোস্টকার্ড বার করে ফেলুদাকে দিলেন। হিন্দিতে লেখা আট-দশ লাইনের চিঠি। সেটা ফেলুদা বার বার পড়ল কেন, আর পড়ে বিড়বিড় করে দু বার মোস্ট ইন্টারেস্টিং বলল কেন, সেটা বলতে পারব না।

মিঃ পণ্ডিত আমাদের একটা ভাল ট্যাক্সির কথা বলে দিলেন। আপাতত রুদ্রপ্রয়াগ, তার পর যেখানেই যাওয়া দরকার-সেখানেই যাবে। গাড়োয়ালি ড্রাইভারের নাম যোগীন্দরীরাম। লোকটিকে দেখে আমাদের ভাল লাগল। আমরা বললাম, বারোটা নাগাদ খেয়েদেয়ে রওনা দেব হৃষীকেশ থেকে। হৃষীকেশ। এখান থেকে মাইল পনেরো। হরিদ্বারে কিছুই দেখবার নেই, গঙ্গার ঘাটটা পর্যন্ত আগের বার যা দেখেছিলাম, তেমন আর নেই। বিশ্রী দেখতে সব নতুন বাড়ি উঠেছে আর তাদের দেওয়াল-জোড়া বিজ্ঞাপন। হৃষীকেশে যাওয়া দরকার, কারণ আমাদের রুদ্রপ্রয়াগে থাকার বন্দোবস্ত করতে হবে। ইচ্ছে করলে ধরমশালায় থাকা যায়; এখানে প্রায় সব শহরেই বহু দিনের পুরনা নাম-করা কালীকমলী ধরমশালা রয়েছে, কিন্তু ফেলুদা জানে যে রূপনারায়ণগড়ের ছোটকুমার ও সব ধরমশালায় থাকবে না।

আমরা হৃষীকেশে গিয়ে গাড়ওয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের রেস্ট হাউসে একটা ডবল-রুম পেয়ে গেলাম। ওরা বলল যে, তিনজন লোক হলে বাড়তি একটা খাটিয়া পেতে দেবে। বারোটা নাগাদ খেয়ে আমরা রওনা দিলাম রুদ্রপ্রয়াগ। কয়েক মাইল যাবার পর ডাইনে পড়ল। লছমনঝুলা। এখানেও দুদিকে বিশ্রী বিশ্রী নতুন বাড়ি আর হোটেল হয়ে জায়গাটার মজাই নষ্ট করে দিয়েছে। তাও বাদশাহী আংটির শেষ পর্কের ঘটনা মনে করে গা-টা বেশ ছমছম করছিল।

রুদ্রপ্রয়াগ জরুরি দুটো কারণে; এক হল জিম করবেট। দ্য ম্যান-ইটিং লেপার্ড অফ রুদ্রপ্রয়াগ যে পড়েছে, সে কোনও দিন ভুলতে পারবে না। কী আশ্চর্য ধৈর্য, অধ্যবসায়, আর সাহসের সঙ্গে করবেট মেরেছিল। এই মানুষখেকোকে আজ থেকে পঞ্চান্ন বছর আগে। আমাদের ড্রাইভার যোগীন্দর বলল, সে ছেলেবেলায় তার বাপ-ঠাকুন্দর কাছে শুনেছে। এই বাঘ মারার গল্প। করবেট যেমন ভালবাসত এই গাড়োয়ালিদের, গাড়োয়ালিরাও ঠিক তেমনই ভক্তি করত করবেটকে।

রুদ্রপ্রয়াগের আর একটা ব্যাপার হচ্ছে—এখান থেকে বদ্রী ও কেদার দু জায়গাতেই যাওয়া যায়! দুটো নদী এসে মিশেছে রুদ্রপ্রয়াগে—মন্দাকিনী আর অলকানন্দা। অলকানন্দ ধরে গেলে বদ্রীনাথ আর মন্দাকিনী ধরে গেলে কেদারনাথ। বদ্রীনাথের শেষ পর্যন্ত বাস যায়; কেদারনাথ যেতে বাস থেমে যায় ১৪ কিলোমিটার আগে গৌরীকুণ্ডে। সেখান থেকে হয় হেঁটে, না হয় ডাণ্ডি বা টাটু ঘোড়া ভাড়া করে যাওয়া যায়।

হৃষীকেশ থেকে বেরিয়েই বনের মধ্য দিয়ে পাহাড়ের পথ আরম্ভ হয়ে গেল। পাশ দিয়ে বয়ে চলছে স্থানীয় লোকেরা যাকে বলে গঙ্গা মাঈ। হৃষীকেশ থেকে রুদ্রপ্রয়াগ ১৪০ কিলোমিটার; পাহাড়ে রাস্তায় ঘণ্টায় ৩০ কিলোমিটার করে গেলেও সেই সন্ধ্যার আগে পৌঁছানো যাবে না। তা ছাড়া পথে তিনটে জায়গা পড়ে-দেবপ্রয়াগ, কীর্তিনগর, আর শ্রীনগর। এই শ্রীনগর কাশ্মীরের রাজধানী নয়, গাড়ওয়াল জেলার রাজধানী।

পাহাড় ভেদ করে বনের মধ্য দিয়ে কেটে তৈরি করা রাস্তা ঘুরে ঘুরে উঠছে, আবার ঘুরে ঘুরে নামছে। মাঝে মাঝে গাছপালা সরে গিয়ে খোলা সবুজ পাহাড় বেরিয়ে পড়ছে, তারই কোলে ছবির মতো ছোট ছোট গ্রাম দেখা যাচ্ছে।

দৃশ্য সুন্দর ঠিকই, কিন্তু আমার মন কেবলই বলছে ভবানী উপাধ্যায়ের কাছে একটা মহামূল্য লকেট রয়েছে। একজন সন্ন্যাসীর কাছে এমন একটা জিনিস থাকবে, আর তাই নিয়ে কোনও গোলমাল হবে না, এটা যেন ভাবাই যায় না। তা ছাড়া মিঃ পুরীর একবার ফেলুদাকে কাজের ভার দিয়ে, তার পরই টেলিগ্রাম করে বারণ করাটাও কেমন যেন গণ্ডগোল লাগছে। অবশ্য তিনি চিঠিতে কারণ দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু এ জিনিস এর আগে কক্ষনও হয়নি বলেই বোধহয় একটা খটকা মন থেকে যাচ্ছে না।

লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ থেকেই উসখুসি করছিলেন, এবার বললেন, আমি ভূ-গণ্ডগোল আর ইতিহাস-ফাঁসে চিরকালই কাঁচা ছিলাম ফেলুবাবু—সেটা তো আপনি আমার লেখা পড়েও অনেক বার বলেছেন। তাই, মানে, আমরা ভারতবর্ষের এখন ঠিক কোনখানে আছি, সেটা একটু বলে দিলে নিশ্চিন্ত বোধ করব।

ফেলুদা তার বাথোলোমিউ কোম্পানির বড় ম্যাপটা খুলে বুঝিয়ে দিল—এই যে দেখুন হরিদ্বার। আমরা এখন যাচ্ছি। এই দিকে। এই যে রুদ্রপ্রয়াগ। অথাৎ পুবে নেপাল, পশ্চিমে কাশ্মীর, আমরা তার মধ্যিখানে, বুঝেছেন?

হ্যাঁ। এই বারে ক্লিয়ার।

০৩. রুদ্রপ্রয়াগ

পথে শ্রীনগরে থেমে চা খেয়ে রুদ্রপ্রয়াগ পৌঁছতে পৌঁছতে হয়ে গেল প্রায় পাঁচটা। ইস্কুল কলেজ হাসপাতাল পোস্টাপিস থানা, সব মিলিয়ে রুদ্রপ্রয়াগ বেশ বড় শহর। করবেট যেখানে লেপার্ডটা মেরেছিল, সেখানে অনেক দিন পর্যন্ত নাকি সাইনবোর্ড ছিল, কিন্তু যোগীন্দর বলল, সেটা নাকি কয়েক বছর হল ভেঙে গেছে।

আমরা সোজা চলে গেলাম গাড়ওয়াল নিগম রেস্ট হাউসে। শহরের একটু বাইরে সুন্দর নিরিবিলি জায়গায় তৈরি রেস্ট হাউসে গিয়ে যে খবরটা প্রথমেই শুনলাম, সেটা হল : কেদারনাথের রাস্তায় এক জায়গায় ধস নামাতে নাকি বাস চলাচল বেশ কয়েক দিন বন্ধ ছিল, আজই আবার নতুন করে শুরু হয়েছে। এতে যে আমাদের একটা বড় রকম সুবিধে হয়েছিল, সেটা পরে বুঝেছিলাম।

ম্যানেজার মিঃ গিরিধারী ফেলুদাকে না চিনলেও আমাদের খুব খাতির করলেন। উনি নাকি হিন্দি অনুবাদে বহু বাংলা উপন্যাস পড়ে খুব বাঙালি-ভক্ত হয়ে পড়েছেন। ওঁর ফেভারিট অথরস হচ্ছেন বিমল মিত্র আর শংকর।

মিঃ গিরিধারী ছাড়াও আরেকজন ভদ্রলোক ছিলেন রেস্ট হাউসে, তিনি কেদারের পথ বন্ধ বলে আটকা পড়ে গিয়েছিলেন। ইনি। কিন্তু ফেলুদাকে দেখে চিনে ফেললেন। বললেন, আমি একজন সাংবাদিক, আমি আপনার অনেক কেসের খবর জানি; সেভেনটি নাইনে এলাহাবাদে সুখতঙ্কর মার্ডার কেসে আপনার ছবি বেরিয়েছিল নদীর্ন ইন্ডিয়া পত্রিকায়। সেই থেকেই আমি আপনাকে চিনেছি। আমার নাম কৃষ্ণকান্ত ভার্গব। আই অ্যাম ভেরি প্রাউন্ড টু মিট ইউ, স্যার।

ভদ্রলোকের বছর চল্লিশেক বয়স, চাপদাড়ি, মাঝারি গড়ন। মিঃ গিরিধারী স্বভাবতই ফেলুদার পরিচয় পেয়ে ভারী উত্তেজিত হয়ে পড়লেন—দেয়ার ইজ নো ট্রাবল হিয়ার আই হোপ?

ট্রাবল্য সর্বত্রই হতে পারে, মিঃ গিরিধারী। তবে আমরা এসেছি। একটা অন্য ব্যাপারে। আপনাদের এখানে ভবানী উপাধ্যায় নামে একজন ভদ্রলোক–

উপাধ্যায় তো এখানে নেই, বলে উঠলেন সাংবাদিক মিঃ ভার্গব। আমি তো ওঁকে নিয়েই একটা স্টোরি করব বলে এখানে এসেছি। হরিদ্বারে গিয়ে শুনলাম, উনি রুদ্রপ্রয়াগ গেছেন; এখন এখানে এসে শুনছি। তিনি খুব সম্ভবত কেদারনাথ গেছেন। আমি তাই কাল সকালে কেদার যাচ্ছি। ওঁর খোঁজে। হি ইজ এ মোস্ট ইন্টারেস্টিং ক্যারেকটার, মিঃ মিটার।

আমি অবিশ্যি ওঁর অসুখ সারানোর কথা শুনেছি, বলল ফেলুদা। তারপর লালমোহনবাবুর দিকে দেখিয়ে চাপা গলায় বলল, আমার এই বন্ধুটির মাঝে মাঝে একটা মস্তিষ্কের ব্যারামের মতো হয়। ভুল বকেন, সামান্য ভায়োলেন্সও প্রকাশ পায়। তাই একবার ওঁকে দেখাব ভাবছিলাম। কলকাতার অ্যালোপ্যাথি হোমিওপ্যাথিতে কোনও কাজ দেয়নি।

লালমোহনবাবু প্রথমে কেমন থতমত খেয়ে, তার পর ফেলুদার কথা সত্যি প্রমাণ করার জন্য মুখে একটা হিংস্র ভাব আনার চেষ্টা করলেন, যেটা আমাদের একটা নেপালি মুখোশ আছে, সেটার মতো দেখাল।

তা হলে আপনাদের এই কেদার-বদ্রী যাওয়া ছাড়া গতি নেই, বললেন মিঃ ভার্গব।আমি বস্ত্রী গিয়ে ওঁকে পাইনি। অবিশ্যি উনি নাকি সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন, তাই নামও হয়তো বদলে নিয়েছেন।

এই সময় রেস্ট হাউসের গেটের বাইরে একটা আমেরিকান গাড়ি থামল, আর তার থেকে তিনজন ভদ্রলোক নেমে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। এদের যিনি দলপতি, তাঁকে চিনতে মোটেই অসুবিধা হল না, কারণ তাঁরই রঙিন ছবি রয়েছে ফেলুদার কাছে। ইনি হলেন রূপনারায়ণগড়ের ছেণ্টিকুমার বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ন পবনদেও সিং। অন্য দুজন নির্ঘাত এঁর

চামড়া।

আমরা পাঁচজন এতক্ষণ বাংলোর সামনের বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলাম, এবার আরও তিনজন লোক বাড়ল। পবনদেও একটা বেতের চেয়ার দখল করে বললেন, আমরা বদ্রীনাথ থেকে আসছি। নো লাক্। উপাধ্যায় ওখানে নেই।

মিঃ গিরিধারী বললেন, আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, আমার এখানে যতজন অতিথি এসেছেন, সকলেই উপাধ্যায়ের খোঁজ করছেন, এবং প্রত্যেকে বিভিন্ন কারণে। আপনি ওঁর ছবি তুলবেন, মিঃ ভার্গব ওঁকে ইন্টারভিউ করবেন, আর মিঃ মিটার তাঁর বন্ধুর চিকিৎসা করবেন।

পবনদেওর দলের সঙ্গে টেলিভিশনের যন্ত্রপাতি রয়েছে। ক্যামেরাটা পবনদেওর নিজের হাতে, আর তাতে লাগানো একটা পোল্লায় লেন্স।

ওটা তো আপনার টেলি-লেন্স দেখছি, ফেলুদা মন্তব্য করল।

পবনদেও ক্যামেরাটা টেবিলের উপর রেখে বলল, হ্যাঁ! সকালের রোদে বদ্রীনাথের চূড়ো থেকে বরফ গলে গলে পড়তে দেখা যায়। অ্যাকচুয়েলি আমার পুরো সরঞ্জাম একজনেই হ্যান্ডল করতে পারে। ক্যামেরা, সাউন্ড, সব কিছু। আমার এই দুই বন্ধু থাকবেন। গৌরীকুণ্ড পর্যন্ত। বাকিটা আমি একাই তুলব।

তার মানে আপনিও কেদারনাথ যাচ্ছেন?

হ্যাঁ। কাল ভোরেই বেরিয়ে পড়ছি।

আপনি ভবানী উপাধ্যায়কে নিয়ে ফিল্ম তুলছেন?

হ্যাঁ। অস্ট্রেলিয়ান টেলিভিশনের জন্য। উপাধ্যায় মানে, তার সঙ্গে হরিদ্বার-হৃষীকেশ-কেদার-বদ্রীও কিছু থাকবে। তবে সেন্ট্রাল ক্যারেকটার হবেন ভবানী উপাধ্যায়। আশ্চর্য চরিত্র। উনি আমার বাবার হাঁপানি যেভাবে সারিয়েছিলেন, সেটা একটা মিরাকল।

আমি আড়াচোখে পবনদেওকে লক্ষ করে যাচ্ছিলাম। মিঃ উমাশঙ্কর পুরী যে চরিত্র বর্ণনা করেছিলেন, তার সঙ্গে কোনও মিল পাচ্ছিলাম না; ফেলুদা দেখলাম উমাশঙ্কর পুরীর কোনও উল্লেখ করল না।

রুদ্রপ্রয়াগে পৌঁছানোর সময় একটা হোটেল দেখে রেখেছিলাম, সেইখানেই আমরা তিনজন গিয়ে ডিনার সারলাম। বয় যখন আড়ার নিতে এল, তখন লালমোহনবাবু হঠাৎ ভীষণ তেজের সঙ্গে টেবিলের উপর একটা ঘুষি মেরে একটা গোলমরিচদান উলটে দিয়ে বললেন, তিনি আরমাডিলোর ডিমের ডালনা খাবেন। তখন ফেলুদার তাঁকে বুঝিয়ে বলতে হল যে, যাদের কাছে ওঁর অসুখের কথাটা বলা হয়েছে, শুধু তাদের সামনেই এই ধরনের ব্যবহার চলতে পারে, অন্য সময় নয়। বিশেষ করে ভায়োলেন্সটা যার-তার সামনে দেখাতে গেলে হয়তো লালমোহনবাবুকেই প্যাদানি খেতে হবে।

তা বটে; বললেন লালমোহনবাবু; তবে অপরচুনিটি পেলে কিন্তু ছাড়ব না।

পরদিন ভোরে উঠতে হবে বলে আমরা খাওয়ার পর্ব শেষ করেই রেস্ট হাউসে চলে এলাম! কেউ কোনও হুমকি চিঠি দিয়ে যায়নি তো এই ফাঁকে? আমাদের আবার এই জিনিসটার একটা ট্র্যাডিশন আছে। কিন্তু না; এদিক ওদিক দেখেও তেমন কিছু পেলাম না।

আমাদের দুটো ঘর পরেই যে পবনদেও তার দুই বন্ধু আর মিঃ গিরিধারীকে নিয়ে পানীয়ের সদ্ব্যবহার করছেন, সেটা গেলাসের টুং টাং আর দমকে দমকে হাসি থেকেই বুঝতে পারছিলাম।

লালমোহনবাবু তাঁর বালিশে মাথা দিয়ে বললেন, একটা কথা কিন্তু বলতেই হবে। ফেলুবাবু—সে দিন আপনার ঘরে বসে পুরী সাহেব ছোটকুমার সম্বন্ধে যাই বলে থাকুন না কেন, আমার কিন্তু ভদ্রলোককে বেশ মাই ডিয়ার বলেই মনে হচ্ছে।

ফেলুদা বলল, প্রকৃতি কিন্তু অনেক হিংস্র প্রাণীকেই সুন্দর করে সৃষ্টি করেছে। বাংলার বাঘের চেয়ে সুন্দর কোনও প্রাণী আছে কি? ময়ূরের ঠোকরানিতে যে কী তেজ আছে, তা তো। আপনি জানেন। জানেন না?

লালমোহনবাবু তাঁর অ্যালাম ক্লকের চাবিটায় একটা মোচড় দিয়ে, চোখে একটা হিংস্র। উন্মাদ ভাব এনে বললেন—পোপোক্যাটাপেটাপোটাপুলটিশ

০৪. পবনদেওর আমেরিকান গাড়ি

আমরা ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় ট্যাক্সির সামনে গিয়ে হাজির হলাম। যোগীন্দররাম তার আগেই রেডি। আমাদের গাড়ির কাছেই পবনদেওর আমেরিকান গাড়িতে মাল তোলা হচ্ছে। ও গাড়ি আধা ঘণ্টার আগে বেরোতে পারবে বলে মনে হয় না। তবে এও ঠিক যে, মাঝপথে ও আমাদের ছড়িয়ে যাবে।

ট্যাক্সিতে যখন উঠতে যাব, তখন ছোটকুমার হঠাৎ আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। বোঝাই যাচ্ছে কিছু বলার আছে।

ভদ্রলোক ফেলুদাকে উদ্দেশ করে বললেন, কাল রাত্রে মিঃ গিরিধারী নেশার ঝোঁকে আপনার আসল পরিচয়টা আমাদের দিয়ে দিয়েছেন। আমি আপনাকে একটা সোজা প্রশ্ন করতে চাই।

বলুন।

উমাশঙ্কর কাকা কি আমার উপর চোখ রাখার জন্য আপনাকে এ কাজে বহাল করেছেন?

তিনি যদি সেটা করেও থাকতেন, বলল ফেলুদা, সেটা আমি নিশ্চয়ই আপনার কাছে প্রকাশ করতাম না, কারণ সেটা নীতিবিরুদ্ধ এবং বোকামি হত। তবে আমি আপনাকে বলেই দিচ্ছি-আসলে আমি মিঃ পুরীর হয়ে কিছু করছি না; আমাদের এখানে আসার প্রধান উদ্দেশ্য ভ্রমণ। তবে যদি কোনও গণ্ডগোল দেখি, তা হলে গোয়েন্দা হয়ে আমার নিজেকে সংযত রাখা খুবই মুশকিল হবে। ভবানী উপাধ্যায় সম্পর্কে আমার নিজেরও একটা প্রবল কৌতুহল জেগে উঠেছে। তার একটা বিশেষ কারণ আছে, যদিও এখনও সেটা প্রকাশ করতে পারছি না।

আই সি।

এবার আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?

করুন।

আপনি কি আপনার ফিল্মে সেই বিখ্যাত লকেটটি দেখাতে চান?

নিশ্চয়ই। অবিশ্যি সেটা যদি এখনও উপাধ্যায়ের কাছে থেকে থাকে।

কিন্তু উপাধ্যায়ের কাছে যে ও-রকম একটা জিনিস আছে, সেটা জানাজানি হয়ে গেলে তো। ওঁর জীবন বিপন্ন হয়ে উঠবে। এত দিন যে-ব্যাপারটা গোপন ছিল, সেটা আপনি প্রচার করে দেবেন?

মিঃ মিত্তির, তিনি যদি সত্যিই সন্ন্যাসী হয়ে থাকেন, তা হলে তো তাঁর আর ও জিনিসের কোনও প্রয়োজনই থাকতে পারে না। আমি ওঁকে বলব, একটা কোনও বড় মিউজিয়ামে ওটা দান করে দিতে। জিনিসটা চারশো বছর আগে

ত্রিবাঙ্কুরের রাজার ছিল। কারিগরির দিক দিয়ে অতুলনীয়। উনি ওটা ডোনেট করলে চিরকাল ওঁর নাম ওই লকেটের সঙ্গে জড়িত থাকবে। মোটকথা, ওই লকেট আমি ছবিতে দেখাচ্ছি, এবং সেখানে আপনি আশা করি কোনও বাধা দিতে চেষ্টা করবেন না।

শেষের কথাটা বেশ দাপটের সঙ্গেই বলে ছোটকুমার তাঁর গাড়িতে ফিরে গেলেন। এবার তাঁর জায়গায় সাংবাদিক মিঃ ভাগবি এসে বললেন, আপনারা তিনজন আছেন জানলে তো আপনাদের সঙ্গেই যাওয়া যেত। উপাধ্যায় সম্বন্ধে আমি যে-সব তথ্য আবিষ্কার করেছি, সেগুলো আপনাকে বলতে পারতাম।

আপনার এই তথ্যের সোর্স কী? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

কিছু দিয়েছেন রূপনারায়ণগড়ের বড় কুমার সূর্যদেও, কিন্তু আসল তথ্য দিয়েছে রাজবাড়ির এক আশি বছরের বুড়ো বেয়ারা। আপনি কি জানেন যে, রূপনারায়ণগড়ের রাজা চন্দ্রদেও সিং-এর হাঁপানি উপাধ্যায় সারিয়ে দিয়েছিলেন?

তই বুঝি?

আর তার জন্য রাজা তাঁকে ইনাম দিয়েছিলেন ওয়ান অফ হিজ মোস্ট প্রেশাস অনামেন্টস। এ খবর এত দিন ওদের ফ্যামিলির বাইরে কেউ জানত না। আপনি ভাবতে পারেন, খবরের কাগজের কাছে এই ঘটনার কী দাম?

আপনি তো তা হলে রাজা হয়ে যাবেন, মিঃ ভার্গব!

আমি আপনাকে বলছি মিঃ মিত্তর, এই লকেট উপাধ্যায়ের কাছে বেশি দিন থাকবে না। আপনি কি ছাটকুমারের কথায় বিশ্বাস করেন যে, ও শুধু টি. ভি-র ছবি তুলতে এসেছে? আমি বলছি আপনাকে, এখানে শিগগিরই আপনার নিজের পেশার আশ্রয় নিতে হবে।

তার জন্য আমি সদা প্রস্তুত, বলল ফেলুদা।

মিঃ ভার্গব চলে গেলেন।

লোকটা তো ঘোড়েল আছে, মশাই, বললেন লালমোহনবাবু।

সাংবাদিক মাত্রেই ঘোড়েল, বলল ফেলুদা।গোয়েন্দাগিরিতে ওরাও কম যায় না। রাজবাড়ির পুরনো বেয়ারাকে জেরা করায় ও খুব বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। চাকরা অনেক সময় এমন খবর রাখে, যা মনিবেরা জানতেই পারে না। কিন্তু তাও—

তাও কী? আমি জিজ্ঞেস করলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম, ফেলুদার মনটা খচখচ করছে।

তাও যে কেন লোকটাকে দেখে আসোয়াস্তি লাগছে, তা বুঝতে পারছি না। আমাদের গাড়ি রুদ্রপ্রয়াগ থেকে রওনা হয়ে অলকানন্দার পাশ দিয়ে কিছু দূর গিয়ে হঠাৎ একটা টানেলে ঢুকে পড়ল। সেই টানেল থেকে যখন আবার আলোয় বেরেলাম, তখন নদী পালটে গিয়ে হয়ে গেছে মন্দাকিনী। এটাই এখন চলবে আমাদের সঙ্গে কেদার পর্যন্ত। কেদার থেকেই নাকি মন্দাকিনীর উৎপত্তি।

ফেলুদার ভ্রূকুটি থেকেই বুঝতে পারছিলাম, কোনও একটা কারণে ওর বিরক্ত লাগছে। এবারে ওর কথায় সেটা বুঝতে পারলাম—

আমার সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ছে ওই গিরিধারী লোকটার উপর। ও যে এত ইরেসপনসিবল তা ভাবতে পারিনি। ছোটকুমার এখন যে কথাগুলো বললেন, সেগুলো অবিশ্যি ওঁর পক্ষে স্বাভাবিক। তবে আশ্চর্য লাগছে জেনে যে, মিঃ পুরীর সঙ্গে ওঁর আর দ্বিতীয়বার কোনও কথাই হয়নি। সেক্ষেত্রে মিঃ পুরীর চিঠি, টেলিগ্রাম দুটোই রহস্যজনক হয়ে উঠছে। অবিশ্যি সবই নির্ভর করছে, কে সত্যি বলছে কে মিথ্যে বলছে তার উপর। মোটকথা, কেস ড্রপ করলেও, এখানে আসার সিদ্ধান্ত যে ড্রপ করিনি, সেটা খুব ভাগ্যের কথা।

গৌরীকুণ্ড রুদ্রপ্রয়াগ থেকে আশি কিলোমিটার হলেও এত চড়াই-উতরাই আর এত ঘোরপ্যাঁচের রাস্তা, যেতে বেশ সময় লাগে। পথে তিনটে শহর পড়ে। ৩০ কিলোমিটারের মাথায় অগস্ত্যমুনি, হাইট আন্দাজ ৯০০ মিটার; সেখান থেকে ৯ কিলোমিটার দূরে গুপ্তকাশী—যদিও হাইট এইটুকুর মধ্যে বেড়ে যাচ্ছে ডবল। গুপ্তকাশী থেকে শোনপ্রয়াগ, যেখানে শোনগঙ্গা মন্দাকিনীর সঙ্গে এসে মিশেছে। এই শোনপ্রয়াগ থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে হল গৌরীকুণ্ড—যদিও সেখানে গিয়ে হাইট হয়ে যাচ্ছে সেয়া দু হাজার মিটার।

আমাদের গরম জামা যাতে প্রয়োজন হলে সহজেই বার করে নেওয়া যায়, তার ব্যবস্থা আমরা করে নিয়েছিলাম। বড় সুটকেস জাতীয় মাল আমাদের সঙ্গে যা ছিল, তা সবই গাড়ওয়াল নিগম রেস্ট হাউসের লকারে রেখে দিয়ে এসেছি, ফেরার সময় আবার নিয়ে যাব। লালমোহনবাবুর টাকের জন্য উনি এর মধ্যেই টুপি পরে নিয়েছেন, যদিও আমাদের বাঙালি মাঙ্কি ক্যাপ না; রাজস্থান থেকে কেনা। কান-ঢাকা পশমের লাইনিং দেওয়া স্মার্ট চামড়ার টুপি।

অগস্ত্যমুনি পৌঁছে গাড়ি থামিয়ে যখন আমরা গরম জামা পারছি, তখন আমাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল পবনদেওর আমেরিকান টুরার। ছোটকুমার জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ওয়েভ করাতে ফেলুদাকে হাত নাড়াতে হল।

আমরা শীতের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য তৈরি হয়ে আবার রওনা দিলাম। বাঁয়ে মন্দাকিনী একবার আমাদের পাশে চলে আসছে, আবার পরীক্ষণেই নেমে যাচ্ছে সেই খাদের একেবারে নীচে। নদীর শব্দ ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে লালমোহনবাবুর সুর করে বলা, ওরে তোরা কি জানিস কেউ, জলে কেন এত ওঠে ঢেউ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস উনি পুরো কবিতাটার কেবলমাত্র ওই দুটো লাইনই জানেন।

শেষে ফেলুদা আর থাকতে না পেরে লাইন যোগ করতে শুরু করে দিল—ওরে তোরা কি জানিস কেউ, কেন বাঘ এলে ডাকে ফেউ...ওরে তোরা কি শুনিস কেউ, কুকুরের ঘেউ ঘেউ, খোকা কাঁদে ভেউ ভেউ...

গুপ্তকাশী যখন পৌঁছলাম, তখন বেজেছে দশটা। এখানে একটা চায়ের দোকান দেখে থামতে হল। যাকে ব্রেকফাস্ট বলে সেটা সকালে হয়নি, কাজেই খিদেটা ভালই হয়েছিল। গরম জিলিপি, কচুরি আর চা দিয়ে দিব্যি ব্রেকফাস্ট হয়ে গেল।

যোগীন্দরের এক ভাই কাছেই থাকে, সে বলল তার সঙ্গে পাঁচ মিনিটের জন্য দেখা করে আসছে। সেই ফাঁকে লালমোহনবাবু চন্দ্রশেখর মহাদেব আর অর্ধনারীশ্বরের মন্দিরগুলো দেখতে গেলেন।

গুপ্তকাশী থেকে পাহাড়ের উপর দেখা যায় উধীমঠ। নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত কেদারের পথ যখন বরফের জন্য বন্ধ থাকে, তখন কেদারেশ্বরের পুজো এই উখীমঠেই হয়ে থাকে।

লালমোহনবাবু মন্দির দেখে ফিরে এলেন, কিন্তু যোগীন্দরের ফেরার নাম নেই। ফেলুদা আর আমি ব্যস্তভাবে এদিক-ওদিক দেখছি। এমন সময় দেখি, ছোটকুমারের গাড়ি আসছে। ওরা আমাদের পেরিয়ে গিয়ে আবার পিছিয়ে পড়ল কেন?

আমাদের দেখে গাড়ি থামিয়ে কুমার নেমে এলেন। বললেন, গুপ্তকাশী থেকে নাকি কেদার ও বস্ত্রী দুটো চূড়েরই ভিউ পাওয়া যায়, তাই ওঁরা এখানে কিছুটা সময় দিলেন। তবে আর দেরি করলে চলবে না, কারণ তা হলে যাত্রীদের রওনা দেবার দৃশ্য তোলার জন্য আর আলো থাকবে না।

কিন্তু তাও যোগীন্দরের দেখা নেই। তার বদলে দেখা দিলেন সাংবাদিক মিঃ। ভার্গব। তাঁর গাড়িটা আগে দেখেছিলাম, আর ভাবছিলাম। তিনি এখানে এতক্ষণ কী করছেন। ভদ্রলোক বললেন যে, কেদারনাথের সেবায়েতের একজন নাকি এখানে রয়েছেন। এরা সকলেই রাওয়াল পরিবারের লোক; এই বিশেষ রাওয়ালটির সঙ্গে নাকি একটা ইন্টারভিউ নিতে গিয়েছিলেন মিঃ। ভার্গব। এখনই আবার তাঁকে ছুটতে হবে শোনপ্রয়াগ হয়ে গৌরীকুণ্ড।

মিঃ ভার্গব চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে একটা বছর পনেরোর ছেলে এসে হঠাৎ ফোর-থার্টি-ফোর ট্যাক্সি কি কোই পাসিঞ্জর হ্যায় হ্যাঁ? বলে হাঁক দিতেই ফেলুদা ব্যস্তভাবে তার দিকে এগিয়ে গেল।

ফোর-থ্রি-জিরো-ফোর কি পাসিঞ্জর?

হ্যাঁ। কেন, কী হয়েছে?

ব্যাপার আর কিছুই না, আমাদের গাড়ির ড্রাইভার জখম হয়ে পড়ে আছে কিছু দূরে। ছেলেটি তাকে চেনে বলে সে খবর দিতে এসেছে।

লালমোহনবাবুকে আমাদের জিনিসপত্র পাহারা দেবার জন্য রেখে, আমরা দুজন ছেলেটাকে অনুসরণ করে গেলাম।

পাঁচ-সাতটা বাড়ি নিয়ে একটা নিরিবিলি পাড়ায় একটা কলাগাছের ধারে যোগীন্দরীরাম মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। তার মাথার পিছন দিকের ঘন কালো চুলে রক্তের ছাপ। শরীরের ওঠা-নমা থেকে বোঝা যাচ্ছে সে মরেনি, কিন্তু ফেলুদা তাও দৌড়ে গিয়ে তার নাড়ি পরীক্ষা করল।

কে এই কুকীর্তি করেছে, এ নিয়ে চিন্তা করার সময় নেই; এখন দরকার ওর চিকিৎসা। ছাকরাটি বলল, এখানে হাসপাতাল দাওয়াখানা দুইই আছে। সে আবার গাড়িও চালাতে জানে। শেষ পর্যন্ত সে-ই নিজে ট্যাক্সি চালিয়ে যোগীন্দরকে হাসপাতালে নিয়ে গেল।

সব মিলিয়ে ঘণ্টা দেড়েক দেরি হয়ে গেল! যোগীন্দরের মাথায় ব্যান্ডেজ, ব্যথাও আছে; তাকে বলা হল যে এখান থেকে অন্য ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে দিলে, আমরা তাতেই যাব। কিন্তু সে রাজি হল না। সে নিজেই যাবে আমাদের নিয়ে।

কে মেরেছিল, কিছু বুঝতে পেরেছিলে? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

নেহি, বলল যোগীন্দর, পিছে সে আ করা মারা।

এখানে তোমার কোনও দুশমন আছে?

কেই ভি নেহী।

ফেলুদা কী ভাবছে সেটা আমি জানি। দুশমন। যদি থাকে তো সে আমাদের দুশমন। আমাদের দেরি করিয়ে দেবার জন্য ব্যাপারটা করা হয়েছে। শত্রু কে আমরা বুঝতে না পারলেও, শত্রু যে রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

আমরা রওনা হবার পর আমি ফেলুদাকে বললাম, আচ্ছা, মিঃ পুরী যে তোমার কাছে এসেছিলেন, সেটা জানতে পেরে ছোটকুমার তাঁকে দিয়ে টেলিগ্রামটা করিয়ে চিঠিটা লেখায়নি। তো?—যাতে তার কাজে ফেলুমিত্তির কোনও বাধার সৃষ্টি না করতে পারে?

এটা তুই খুব ভাল ভেবেছিস তোপ্‌সে। কথাটা আমারও মনে হয়েছে। অবিশ্যি তার মানে এটাও বোঝা যায় যে, মিঃ পুরীর উপর এতটা কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা ছোটকুমারের আছে।

তা থাকবে না কেন, বললেন লালমোহনবাবু, ছেট্রকুমার ইজ এ প্রিন্স, অ্যান্ড পুরী ইজ ওনলি এ কর্মচারী।

ঠিক বলেছেন। আপনি, বলল ফেলুদা, এখানে বয়সের তফাতটা কিছু ম্যাটার করে না।

তবে হ্যাঁ-এটাও ঠিক যে টেলিগ্রাম আর চিঠি সত্ত্বেও যে আমি চলে আসব, সেটা বোধহয় ছোট কুমার ভাবতেই পারেনি।

তার মানে যোগীন্দরকে জখম ওরাই করিয়েছে?

যোগীন্দর যখন বলছে এখানে ওর কোনও শত্রু নেই, তখন আর কী হতে পারে?

এক্সকিউজ মি স্যার, বললেন লালমোহনবাবু, আমার কিন্তু ওই সাংবাদিক লোকটিকেও বিশেষ সুবিধের লাগছে না।

কেন বলুন তো? আমার নিজেরও যে ভদ্রলোককে একেবারে আদর্শ চরিত্র বলে মনে হচ্ছে তা নয়। কিন্তু আপনার ভাল না-লাগার কারণটা জানার কৌতুহল হচ্ছে।

সাংবাদিক হলে পকেটে কলম থাকবে না? বললেন লালমোহনবাবু।বাইরের পকেটে তো নেই-ই, কাল যখন কোিট পরছিল তখন দেখলাম বুক পকেটেও নেই, শার্টের পকেটেও নেই।

আমার মতো যদি একটা মাইক্রোক্যাসেট রেকর্ডার থাকে?

লালমোহনবাবু যেন কথাটা শুনে একটু দামে গেলেন। বললেন, তা যদি হয়, তা হলে অবশ্য আলাদা কথা। আসলে আমার চাপ-দাড়ি দেখলেই কেমন যেন একটা সন্দেহ হয়।

যাকগে্-এবার একটু কাজের কথায় আসা যাক।

কী?

আপনি কোনটা প্রেফার করবেন–ঘোড়া না ডাণ্ডি?

ন্যাচারেলি আপনারা যেটা প্রেফার করবেন, সেটাই। এক যাত্রায় তো আর পৃথক ফল হতে পারে না।

কেদারের পথ সম্বন্ধে আপনার কিঞ্চিৎ ধারণা আছে, আশা করি?

হ্যাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

হাসছেন কেন?

আমার ধারণাটা বোধহয় আপনার চেয়েও ভিভিড, কারণ কেদার-যাত্রা সম্বন্ধে এথিনিয়ামের বাংলা শিক্ষক বৈকুণ্ঠ মল্লিক, যা লিখে গেছেন, তার তুলনা লিটারেচারে বেশি পাবেন না। তপেশ, জানো পোয়েমটা?

না তো!

শুনুন ফেলুবাবু।

দাঁড়ান, সামনে দুটো ইউ-টার্ন আসছে, সেগুলো পেরিয়ে যাক। সোজা রাস্তা না পেলে আবৃত্তি করাও যায় না, শোনাও যায় না. মিনিট দশেক পরে একটা সোজা রাস্তা পেয়ে লালমোহনবাবু তাঁর আবৃত্তি আরম্ভ করলেন–

“শহরের যত ক্লেদ যত কোলাহল
ফেলি পিছে সহস্র যোজন
দেখ চলে কত ভক্তজন
হিমগিরি বেষ্টিত এই তীর্থপথে
শুধু আজ নয়, সেই পুরাকাল হতে–
সাথে চলে মন্দাকিনী অটল গাম্ভীর্য মাঝে ক্ষিপ্রা প্রবাহিনী”–

এইবার হচ্ছে আসল ব্যাপার। শুনুন, যাত্রীদের কীভাবে ওয়ার্নিং দিচ্ছেন ভদ্রলোক–

“তবে শুনি এবে অভিজ্ঞের বাণী–
দেবদর্শন হয় জেনো বহু কষ্ট মানি
গিরিগাত্রে শীর্ণপথে যাত্রী অগণন
প্রাণ যায় যদি হয় পদস্থলন,
তাও চলে অশ্বারোহী, চলে ডাণ্ডিবাহী,
যষ্টিধারী বৃদ্ধ দেখ তাঁরও ক্লান্তি নাহি
আছে শুধু অটল বিশ্বাস
সব ক্লান্তি হবে দূর, পূর্ণ হবে আশ
যাত্রা অন্তে বিরাজেন কেদারেশ্বর
সর্ব্বগুণ সর্ব্বশক্তিধর
মহাতীর্থে মহাপুণ্য হবে নিশ্চয়
উচ্চকণ্ঠে বল সবে–কেদারের জয়?’

হুঁ, বলল ফেলুদা, বোঝাই যাচ্ছে, মল্লিক মশাই কবিতা লিখেছিলেন বাস-ট্যাক্সির যুগের অনেক আগে।

সার্টেনলি, বললেন লালমোহনবাবু, তাঁকে তীর্থযাত্রীর পুরো ধকল ভোগ করতে হয়েছিল।

কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে-আপনি কি আশ্বারোহী হতে চান, না ডাণ্ডির দ্বারা বাহিত হতে চান, না পয়দল যেতে চান।

সেটা সব ডিপেন্ড করছে। আপনাদের উপর। দলচুত হবার প্রশ্ন তো আর উঠতে পারে না।

আমি আর তোপ্‌সে তো হেঁটেই যাব স্থির করেছি। আপনার পক্ষে ডাণ্ডিটা সবচেয়ে নিরাপদ, কারণ ঘোড়াগুলোর টেন্ডেন্সি হচ্ছে পথের যে দিকটায় খাদ, তার কানা ধরে চল। সে টেনশন আপনার সহ্য হবে না।

লালমোহনবাবু ভয়ঙ্কর রকম গভীর হয়ে বললেন, শুনুন ফেলুবাবু, আপনি কিন্তু আমার ক্ষমতাকে ক্রমান্বয়ে আন্ডার এস্টিমেট করে চলেছেন। আমি গেলে হেঁটে যাব, আর নয়তো যাব না। এই আমার সোজা কথা।

যাক, তা হলে এটা সেট্‌লড, বলল ফেলুদা।

একটা প্রশ্ন আমি করতে পারি কি? বললেন লালমোহনবাবু—অবিশ্যি এটা জার্নি সম্বন্ধে নয়।

নিশ্চয় পারেন।

এরা তো মশাই আমাদের চিনে ফেলেছে; এখন কেদার গিয়ে আমরা করছিটা কী?

সেটা সব নির্ভর করছে—কে আগে উপাধ্যায়ের সন্ধান পায় তার উপর।

ধরুন যদি আমরাই পাই।

তা হলে তাঁকে সবিস্তারে ব্যাপারটা বলতে হবে। সন্ন্যাসী হয়ে তাঁর মনোভাব যদি বদলে গিয়ে থাকে, তা হলে হয়তো লকেটটা উনি আর নিজের কাছে রাখতে চাইবেন না। আমাদের কর্তব্য হবে।–তিনি সেটা কাকে দিয়ে যেতে চান, তাঁর অনুসন্ধান করা-অবশ্য সে রকম লোক যদি কেউ থেকে থাকে। এর মধ্যে যদি ছোটকুমারও উপাধ্যায়ের সন্ধান পেয়ে যান, তা হলে তিনি হয়তো লকেটটার ছবি তুলতে চাইবেন। চন্দ্রদেওর ছেলে বলে উপাধ্যায় হয়তো স্নেহবশত তাতে রাজিও হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু উপাধ্যায়ের আমতে পবনদেওকে কোনও মতেই লকেটটা হস্তগত করতে দেওয়া যায় না। অবিশ্যি সে যে সেটা হাত করতে চাইছে, এমন বিশ্বাস করার কোনও কারণ এখনও ঘটেনি। আমরা শুধু অনুমান করছি যে, সে-ই হুমকি দিয়ে মিঃ পূরীকে চিঠি ও টেলিগ্রামটা পাঠাতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু তারও এখনও কোনও প্রমাণ নেই। টেলিভিশনের ছবি তোলা ছাড়া তার আর কোনও উদ্দেশ্য নাও থাকতে পারে।

আমি বললাম, কিন্তু সাংবাদিক মিঃ ভাগবও যে উপাধ্যায়ের খোঁজ করছেন।

ফেলুদা বলল, আমার বিশ্বাস ভার্গব যখন আসল ঘটনা জেনে গেছে, তখন তার শুধু দুটো ছবি পেলেই কাজ হয়ে যাবে-একটি উপাধ্যায়ের, একটি লকেটের। কারণ এই কাহিনী খবরের কাগজে প্রকাশিত হলে ভার্গবের অন্তত কিছু দিন আর অন্নচিন্তা থাকবে না।

ইতিমধ্যে আমাদের গাড়িটা কিন্তু অত্যন্ত বেয়াড়া রকম চড়াই উঠে দশ হাজার ফুট বা সাড়ে তিন হাজার মিটারের উপরে পৌঁছে গেল। অন্তত যোগীন্দর তাই বলল, আর সেই সঙ্গে বাইরের কনকনে শীতেও তার প্রমাণ পেলাম। এখন মাঝে মাঝে বরফের পাহাড়ের চূড়ো দেখা যাচ্ছে, কিন্তু কোনটা যে কোন শৃঙ্গ তা বুঝতে পারছি না। মিনিট পনেরোর মধ্যেই গৌরীকুণ্ড পৌঁছে যাওয়া উচিত। ঘড়ি বলছে পাঁচটা পনেরো। দূরে পাহাড়ের চূড়োয় উজ্জ্বল রোদ থাকলেও আশেপাশের পাহাড়ে পাইন আর রডোডেনড্রনের বনে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।

একটা মোড় ঘুরে সামনে ঘর বাড়ি গাড়ি ঘোড়া ইত্যাদি দেখে বুঝলাম যে, আমরা গৌরীকুণ্ডে এসে গেছি। এটাও বুঝলাম যে, আজ রাতটা এখানেই থাকতে হবে। আমাদের কেদার-যাত্রা শুরু হবে কাল ভোরে। আর ভোরে রওনা হলেও চোদ্দ কিলোমিটার চড়াই পথ যেতে সন্ধে হয়ে যাবে। অর্থাৎ আসল ঘটনা যা ঘটবার, তা পরশুর আগে নয়।

বাস টারমিনাস হবার ফলে ছোট জায়গা হওয়া সত্ত্বেও গৌরীকুণ্ডে ব্যস্ততার শেষ নেই। ঘোড়া, ডাণ্ডি, কাণ্ডি, কুলি– এদের সঙ্গে দর-দস্তুরি চলছে। কাণ্ডি জিনিসটা ঝুড়ি টাইপের। এতে করেও মানুষ যায়, যদিও দেখে মোটেই ভরসা হয় না।

এখানে রাত্রে থাকতে হবে জেনেও আগে কোনও বন্দোবস্ত করিনি। কারণ, জানি অন্তত একটা ধরমশালা কি চটি পেয়ে যাব। সত্যিই দেখা গেল, জায়গার কোনও অভাব নেই। এখানে পাণ্ডারা ঘর ভাড়া দেয়। বিছানা বালিশ লেপ কম্বল সবই দেয়। পাণ্ডার বাঙালি না। হলেও বাঙালি যাত্রী এত আসে যে, এরা দিব্যি বাংলা শিখে গেছে। এদের থাকার ঘরগুলো হয় দোতলায়। বেঁটে বেঁটে ঘর, যার সিলিং-এ ফেলুদার প্রায় মাথা ঠেকে যায়। এই ঘরের নীচে থাকে সেই রকমই বেঁটে বেঁটে সারা বাঁধা দোকান। সস্তার ব্যাপার, তবে আমাদের কথা হচ্ছে, রাত্তিরে ঘুমোনো। সেই কাজটায় কোনও ব্যাঘাত হবে বলে মনে হল না।

আমরা এখানে এসেই ছোটকুমারের হলদে আমেরিকান গাড়িটা দেখেছিলাম! ওরা আমাদের চেয়ে ঘণ্টা চারেক আগে পৌঁছেছে নিশ্চয়। অর্থাৎ দুপুরে ঘোড়া নিয়ে রওনা হয়ে রাত্তিরের মধ্যে পৌঁছে যাবে। তার মানে কেদারে একটা পুরো দিনেরও বেশি সময় পাচ্ছে ছোটকুমার।

আমার ধারণা, মিঃ ভাগবও আজ রাত্তিরের মধ্যে পৌঁছে যাবেন।

আশ্চর্য এই যে, সকলেরই উদ্দেশ্য এক-উপাধ্যায় মশাইয়ের সন্ধান করা।

০৫. পাঁচটার মধ্যে অ্যালার্ম

পাণ্ডাদের ঘরে গভীর ঘুমে রাত কাটিয়ে ভোর পাঁচটার মধ্যে অ্যালার্ম বাজিয়ে উঠে আমরা তিনজনে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

এত ভোরে বিভিন্ন দেশীয় এত যাত্রীর ভিড় এখানে জমায়েত হয়েছে, সেটা ভাবতেই পারিনি। এদের মধ্যে বাঙালি আছে প্রচুর, আর তাদের প্রায় সবাই দলে এসেছে। দল বলতে অবিশ্যি পরিবারও বোঝায়। সত্তর বছরের দাদু থেকে নিয়ে পাঁচ বছরের নাতনি পর্যন্ত, তার মধ্যে মাসি-পিসিও যে নেই, তা নয়।

ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ ক্যামেরা হাতে পবনদেওকে দেখে বেশ অবাক হলাম। তিনি ঘোড়া ভাড়া করেছেন দুটো—একটা নিজের জন্য, আর একটার পিঠে থাকবে সরঞ্জাম। আমাদের দেখে বললেন, শোনপ্রয়াগে নাকি অনেক ইন্টারেস্টিং ছবি তোলার ছিল, তাই কাল এসে পৌঁছতে পৌঁছাতে বেশ রাত হয়েছে। আমাদের সঙ্গেই অবিশ্যি রওনা হচ্ছেন, তবে উনি থেমে থেমে ছবি তুলতে তুলতে যাবেন; ক্যামেরা ও সাউন্ডের সরঞ্জাম থাকবে নিজের সঙ্গে—ফিল্ম, অর্থাৎ কাঁচামাল থাকবে অন্য ঘোড়ার পিঠে।

ফেলুদা ছাটকুমারের কাছ থেকে সরে এসে বলল, রহস্যের শেষ নেই। উনি কি তা হলে কেদারে লোক লাগিয়েছেন উপাধ্যায়কে খুঁজে বার করার জন্য?

যাই হাক, এ সব ভাববার সময় এখন নয়, কারণ আমাদের রওনা দেবার সময় এসে গেছে।

আপনি তা হলে দৃঢ়সংকল্প যে হেঁটেই যাবেন? ফেলুদা লালমোহনবাবুকে আবার জিজ্ঞেস করল।

ইয়েস স্যার, বললেন জটায়ু, তবে হ্যাঁ, আপনাদের সঙ্গে তাল রেখে হাঁটতে পারব কিনা সে বিষয়ে—

সে বিষয়ে আপনি আদৌ চিন্তা করবেন না। আপনি আপনার নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী হাঁটবেন। গন্তব্য যখন এক, রাস্তা যখন এক, তখন পিছিয়ে পড়লেও চিন্তার কারণ কিছু নেই। এই নিন, এইটে হাতে নিন।

আমরা তিনজনের জন্য তিনটে লাঠি কিনে নিয়েছি, যার নীচের অংশটা ছুচোলো লোহা লাগানো। এ লাঠি এখন প্রত্যেক পদযাত্রীর হাতে। এর দাম দুটাকা, ফিরে এসে আবার ফেরত দিলে এক টাকা ফেরত পাওয়া যায়। তারই একটা ফেলুদা লালমোহনবাবুকে দিয়ে দিল।

আমরা ঘড়ি ধরে ছাঁটায় রওনা দিলাম। লালমোহনবাবু যে রকম হাঁক দিয়ে জয় কেদার বলে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ নিলেন—আমার তো মনে হল, তাতেই তাঁর অর্ধেক এনার্জি চলে গেল।

পাহাড়ের গা দিয়ে পাথরে বাঁধানো রাস্তা। শুধু যে শীর্ণ তা নয়, এক-এক জায়গায় একজনের বেশি একসঙ্গে পাশাপাশি যেতে পারে না। এক দিকে পাহাড়, এক দিকে খাদ, খাদের নীচ দিয়ে বেগে বয়ে চলেছে মন্দাকিনী। দু

দিকেই মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ থাকার ফলে যাত্রীদের মাথার উপর একটা চাঁদোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। তবে বেশির ভাগ অংশেই গাছপালা নেই, খালি শুকনো ঘাস আর পাথর। পায়ে যারা হাঁটছে, তাদের মুশকিল হচ্ছে, অশ্বারোহী আর ডাণ্ডিবাহীদের জন্য প্রায়ই তাদের পাশ দিতে হচ্ছে। এখানে নিয়মটা হচ্ছে কি, সব সময়ই পাহাড়ের গা ঘেঁষে পাশ দেওয়া। খাদের দিকটায় গিয়ে পাশ দিতে গেলে পদস্থলনের সমূহ সম্ভাবনা।

যোগব্যায়াম করি বলে বোধহয় আমাদের দুজনের খুব একটা কষ্ট হচ্ছিল না। লালমোহনবাবুর পক্ষে ব্যাপারটা খুব শ্রমসাপেক্ষ হলেও উনি প্রাণপণে চেষ্টা করছিলেন সেটা যেন বাইরে প্রকাশ না পায়। চড়াই ওঠার সময় তো কথা বলা যায় না; এর পর খানিকটা সমতল রাস্তায় আমাদের কাছাকাছি পেয়ে বললেন, তেনজিং নোরকের মাহাত্ম্যটা কোথায়, সেটা এখন বুঝতে পারছি।

মিনিট কুড়ি চলার পর একটা ঘটনা ঘটল, যেটা আমাদের কেদার পৌঁছানোটা আরও আধ ঘণ্টা পিছিয়ে দিল।

একটা বেশ বড় পাথরের খণ্ড পাহাড়ের গা দিয়ে হঠাৎ গড়িয়ে এল সোজা ফেলুদার দিকে। ব্যাপারটা সম্বন্ধে সচেতন হতে যে কয়েকটা মুহূর্ত গেল, তাতেই কিছুটা ড্যামেজ হয়ে গেল! পাথরের ঘষা খেয়ে ফেলুদার হাতের এইচ এম টি ঘড়িটা চুরমার হয়ে গেল, আর আমাদের পাশের এক প্রৌঢ় যাত্রীর লাঠিটা হস্তচ্যুত হয়ে পাশের খাদ দিয়ে পাথরের সঙ্গে ঝড়ের বেগে গড়িয়ে নেমে গেল মন্দাকিনী লক্ষ্য করে।

ফেলুদা একটু হকচকিয়ে গেলেও সেটা মুহূর্তের জন্য। ওর শরীর যে কত মজবুত। আর স্টামিনা যে কী সাংঘাতিক, সেটা বুঝলাম। এই এতখানি খাড়াই পথ হাঁটার পর সোজা পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠে গেল। আমিও ওর পিছন পিছন গিয়েছিলাম, কিন্তু যতক্ষণে ওর কাছে পৌঁছলাম, তার মধ্যেই ও একটা লোকের কলার চেপে তাকে একটা গাছে ঠেসে ধরেছে। লোকটার বয়স বছর পাঁচিশের বেশি না। তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে এবং সে স্বীকার করেছে যে, পাথর ফেলার ব্যাপারে সে আর একজনের আদেশ পালন করছিল। পকেট থেকে দশখানা কড়াকড়ে দশ টাকার নোট বার করে সে দেখিয়ে দিল, কেন তাকে এমন একটা কাজ করতে রাজি হতে হয়েছে।

কে তাকে এই টাকা দিয়েছে জিজ্ঞেস করাতে সে বলল, তারই এক অচেনা জাতভাই। বোঝা গেল আসল লোক সে নয়, সে শুধু দালালের কাজ করেছে।

আপাতত ফেলুদা লোকটার গা থেকে একটা পশমের চাদর খুলে, সেটা দিয়ে তাকে দু হাত সমেত পিছমোড়া করে গাছের সঙ্গে বেঁধে দিল। বলল, যাত্রীদের ফাঁকে ফাঁকে কনস্টেবল থাকে, তাদের একজনকে পেলে তার কাছে পাঠিয়ে দেবে।

লালমোহনবাবুর ভাষায় পাথর ফেলার অন্তর্নিহিত মানেটা সত্যি করে ভাবিয়ে তোলে। ভদ্রলোক বললেন, বোঝাই যাচ্ছে, কেউ বা কাহারা কেদারে আপনার উপস্থিতিটা প্রিভেন্ট করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে।

গৌরীকুণ্ড আর কেদারের মাঝামাঝি একটা জায়গা আছে, যেটার নাম রামওয়াড়া। সকলেই এখানে থামে বিশ্রামের জন্য। চটি আছে, ধরমশালা আছে, চায়ের দোকান আছে। লালমোহনবাবুকে আমরা এখানে আধঘণ্টা বিশ্রাম দেওয়া স্থির করলাম। এখানকার এলিভেশনে আড়াই হাজার মিটার, অর্থাৎ প্রায় আট হাজার ফুট। চারিদিকের দৃশ্য ক্রমেই ফ্যানট্যাস্টিক হয়ে আসছে। লালমোহনবাবু একেবারে মহাভারতের মুডে চলে গেছেন; এমন কী এও বলছেন যে যাত্রাপথে যদি তাঁর পতনও হয়, তা হলেও কোনও আক্ষেপ নেই, কারণ এমন গ্লোরিয়াস ডেথ নাকি হয় না।

ফেলুদা বলল, আপনি কিন্তু পাবলিকের উপর যে পরিমাণে গাঁজাখুরি মাল চাপিয়েছেন, আপনার নরকভোগ না হয়ে যায় না।

হেঃ, বললেন লালমোহনবাবু, যুধিষ্ঠির পর পাননি মশাই নরকভোগের হাত থেকে, আর লালমোহন গাঙ্গুলী!

বাকি সাড়ে তিন মাইলের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। একটা জায়গা থেকে হঠাৎ কেদারের মন্দিরের চুড়ো দেখতে পেয়ে সব যাত্রীরা জয় কেদার! বলে কেউ মাথা নত করে, কেউ হাত জোড় করে, কেউ বা সাষ্টাঙ্গ হয়ে তাদের ভক্তি জানালেন। কিন্তু আবার হাঁটা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই মন্দিরের চূড়ো লুকিয়ে গেল পাহাড়ের পিছনে, আর বেরোল একেবারে কেদার পৌঁছানোর পর। পরে জানলাম যে, এই বিশেষ জায়গা থেকেই এই বিশেষ দর্শনটাকে এরা বলে দেও-দেখ্‌নী।

০৬. পাহাড়ের চূড়োগুলোয় রোদ ঝলমল

কেদার পৌঁছাতে পৌঁছাতে আমাদের হয়ে গেল বিকেল সাড়ে পাঁচটা। তখনও যথেষ্ট আলো রয়েছে, চার দিকের পাহাড়ের চূড়োগুলোয় রোদ ঝলমল করছে।

এতক্ষণ চড়াই-এর পর হঠাৎ সামনে সমতল জমি দেখতে পেলে যে কেমন লাগে, তা লিখে বোঝাতে পারব না। এটুকু বলতে পারি যে, অবিশ্বাস আশ্বাস আনন্দ-সব যেন এক সঙ্গে মনের মধ্যে জেগে ওঠে, আর তার সঙ্গে কৃতজ্ঞতা মেশানো একটা অদ্ভুত শান্ত ভাব। সেটাই বোধহয় যাত্রীদের মনে আরও বেশি ভক্তি জাগিয়ে তোলে।

চারিদিকে সবাই পাথর-বাঁধানো জমিতে শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে জয় কেদার জয় কেদার করছে, মন্দিরটা দাঁড়িয়ে রয়েছে তিন দিকে ঘেরা, বরফের পাহাড়ের মধ্যে, আমরা তিনজন তারই মধ্যে এগিয়ে গেলাম একটা বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে।

এখানে হোটেল আছে—হোটেল হিমলোক-কিন্তু তাতে জায়গা নেই, বিড়লা রেস্ট হাউসেও জায়গা নেই। এক রাত্রের ব্যাপার যখন, মোটামুটি একটা ব্যবস্থা হলেই হল। তাই শেষ পর্যন্ত কালীকমলীওয়ালির ধরমশালায় উঠলাম। আমরা। সামান্য ভাড়ায় গরম লেপ তোশক কম্বল সবই পাওয়া যায়।

কেদারনাথের মন্দির এই কিছুক্ষণ আগে সন্ধ্যা ছাঁটায় বন্ধ হয়ে গেছে, আবার খুলবে। সেই কাল সকাল আটটায়। তাই লালমোহনবাবুর পুজো দেবার কাজটা আজ স্থগিত থাকবে। আপাতত ঠিক এই মুহূর্তে যেটা দরকার, সেটা হল গরম চা। আমাদের থাকার ঘর থেকে নীচে নেমেই চায়ের দোকান পেয়ে গেলাম। এটা হল কাশীর বিশ্বনাথের গলির মতোই কেদারনাথের গলি। দোকানগুলো সবই অস্থায়ী, কারণ নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত বরফের জন্য কেদারনাথে জনপ্রাণী থাকবে না।

আমি ভেবেছিলাম, এই ধাকলের পর লালমোহনবাবু হয়তো একটু বিশ্রাম নিতে চাইবেন। কিন্তু তিনি বললেন যে, তাঁর দেহের রন্ধে রন্ধে নাকি নতুন এনার্জি পাচ্ছেন—তপেশ, এই হল কেদারের মহিমা!

বিশ্বনাথের মতোই এখানেও কেদারের গলির দাকানগুলোতে বেশির ভাগই পুজোর সামগ্রী বিক্রি হয়। এমন কী, বেনারসের সেই অতি-চেনা গন্ধটাও যেন এখানে পাওয়া যায়।

আমরা তিনজনে এলাচ্যু-দেওয়া গরম চা খাচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ চেনা গলায় প্রশ্ন এল-উপাধ্যায়ের সন্ধান পেলেন?

ছোটকুমার পবনদেও সিং। এখনও তার হাতে ক্যামেরা আর বেল্টের সঙ্গে লাগানো সাউন্ড রেকর্ডিং যন্ত্র।

আমরা তো এই মিনিট কুড়ি হল এলাম, বলল ফেলুদা।

আমি এসেছি আড়াইটেয়, বলল পবনদেও! যেটুকু জেনেছি, তিনি এখন পুরোপুরি সাধুই হয়ে গেছেন। চেহারাও সাধুরই মতো। বুঝে দেখুন, এখানে এত সাধুর মধ্যে তাকে খুঁজে বার করা কত কঠিন। একটা ব্যাপার সম্বন্ধে আমি শিওর। তিনি নাম বদলেছেন। উপাধ্যায় বলে কাউকে এখানে কেউ চেনে না।

দেখুন চেষ্টা করে, বলল ফেলুদা, আমরাও খুঁজছি।

পবনদেও চলে গেলেন। লোকটা আমার কাছে এখনও রহস্য রয়ে গেল।

আমরা চা শেষ করে উঠে কয়েক পা এগিয়েছি, এমন সময় আর-একটা চেনা কণ্ঠে বাংলায় একটা প্রশ্ন এল।

এই যে-এসে পড়েছেন? কেমন, আসা সার্থক কিনা বলুন।

আমাদের ট্রেনের আলাপী মাখনলাল মজুমদার।

ষোল আনা সার্থক, বলল ফেলুদা, আমাদের ঘোর এখনও কাটেনি।

হয়নি বলেই তো এখানে এলাম। একজনের সন্ধান করে বেড়াচ্ছি। আগে ছিলেন। হরিদ্বারে; সেখানে গিয়ে শুনি, তিনি চলে গেছেন। রুদ্রপ্রয়াগ। আবার রুদ্রপ্রয়াগে গিয়ে শুনি কেদারনাথ।

কার কথা বলছেন, বলুন তো?

ভবানী উপাধ্যায় বলে এক ভদ্রলোক।

মাখনবাবুর চোখ কপালে উঠে গেল।

ভবানী? ভবানীর খোঁজ করছেন। আপনার? আর সে কথা অ্যাদ্দিন আমাকে বলেননি?

আপনি তাঁকে চেনেন নাকি?

চিনি মানে? সাত বিচ্ছর থেকে চিনি। আমার পেটের আলসার সারিয়ে দিয়েছিল এক বড়িতে। তার পর হরিদ্বার ছাড়ার কিছু দিন আগেও আমার সঙ্গে দেখা করেছে! একটা বৈরাগ্য লক্ষ করেছিলাম ওর মধ্যে। বললে, রুদ্রপ্রয়াগে যাবে। আমি বললাম, বাসরুট হয়ে প্রয়াগ আর এখন সে জিনিস নেই। তুমি জপ তপ করতে চাও তো সোজা কেদার চলে যাও। বোধহয় একটা দেটিনার মধ্যে পড়েছিল, তাই কিছু দিন রুদ্রপ্রয়াগে থেকে যায়। কিন্তু এখন সে এখানেই।

সে তো বুঝলাম, কিন্তু কোথায়?

শহরের মধ্যে তাকে পাবেন না ভাই। সে এখন গুহাবাসী। চোরাবালিতাল নাম শুনেছেন? যাকে এখন গান্ধী সরোবর বলা হয়?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেছি বটে।

ওই চোরাবালিতাল থেকে মন্দাকিনী নদীর উৎপত্তি। কেদারনাথের পিছন দিয়ে পাথর আর বরফের উপর দিয়ে মাইল তিনেক যেতে হবে। হ্রদের ধারে একটা গুহায় বাস করে ভবানী। উপাধ্যায় অংশটা তার নাম থেকে উবে গেছে; এখন সে ভবানীবাবা। এক থাকে, কাছেপিঠে আর কেউ থাকে না। কাল সকালে আপনার চেষ্টা করে দেখতে পাবেন।

আপনার সঙ্গে এবার দেখা হয়েছে?

না, তবে স্থানীয় লোকের কাছে খবর পেয়েছি। ফলমূলের জন্য তাকে বাজারে আসতে হয় মাঝে মাঝে।

আপনি আমাদের অশেষ উপকার করলেন, মিঃ মজুমদার। কিন্তু তাঁর অতীতের ইতিহাস কি এখানে কেউ জানে?

তা তো জানতেই পারে, বললেন মাখনবাবু, কারণ সে তো চিকিৎসা এখনও সম্পূর্ণ ছাড়েনি। এই কেদারনাথের মোহান্তই তো বলছিলেন যে, ভবানী সম্প্রতি নাকি একটি ছেলের পোলিও সরিয়ে দিয়েছে। তবে আমার ধারণা, সে কিছু দিনের মধ্যে আর চিকিৎসা করবে না–পুরোপরি সন্ন্যাসী বনে যাবে।

একটা শেষ প্রশ্ন, বলল ফেলুদা, ভদ্রলোক কোন দেশি তা আপনি জানেন?

এ বিষয় তো তাকে কোনও দিন জিজ্ঞেস করিনি। তবে সে আমার সঙ্গে সব সময় হিন্দিতেই কথা বলেছে। ভাল হিন্দি। তাতে অন্য কোনও প্রদেশের ছাপ পাইনি কখনও।

মাখনবাবু চলে গেলেন।

লালমোহনবাবু ইতিমধ্যে আমাদের দল থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে কার সঙ্গে যেন কথা বলছিলেন। এবার এগিয়ে এসে বললেন, বিড়লা গেস্ট হাউস থেকে আমাদের তলব পড়েছে।

কে ডাকছে? প্রশ্ন করল ফেলুদা।

একজন বেঁটে ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন, মিঃ সিংঘানিয়া।

ফেলুদার ভুরুটা কুঁচকে গেল! আমাদের দিকে ফিরে চাপা গলায় বলল, মনে হচ্ছে এই সিংঘানিয়াই এক ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে হরিদ্বার গিয়েছিলেন উপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে। আমার মনে হয়, একে খানিকটা সময় দেওয়া যেতে পারে-চলিয়ে।

যদিও চারিদিকে অনেকগুলো বরফের পাহাড়ের চূড়োতে এখনও রোদ রয়েছে।–তার কোনওটা সোনালি, কোনওটা লাল, কোনওটা গোলাপি-কেদার শহরের উপর অন্ধকার নেমে এসেছে।

বিড়লা গেস্ট হাউস কেদারনাথের মন্দিরের পাশেই কাজেই আমরা তিন মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম। দেখে মনে হল, এখানে হয়তো এটাই থাকবার সবচেয়ে ভাল জায়গা। অন্তত পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়ে তো বটেই; খাবারের কথা জানি না। খাবারের ব্যাপারে। এমনিতেও শুনছি, এখানে আলু ছাড়া আর বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না।

বেঁটে লোকটা আমাদের আগে আগে পথ দেখিয়ে বিড়লা গেস্ট হাউসের দোতলার একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে হাজির করল। বেশ বড় ঘর, চারিদিকে চারটে গদি পাতা। মাথার উপর একটা ঝুলন্ত লোহার ডাণ্ডা থেকে বেরোনো তিনটি হুকে টিমটিম করে তিনটে বালব। জ্বলছে। কেদারনাথে ইলেকট্রিসিটি আছে বটে, কিন্তু আলোর কোনও তেজ নেই।

আমরা মিনিটখানেক অপেক্ষা করতেই, যিনি আমাদের আহ্বান করেছিলেন, তাঁর আবির্ভাব হল।

০৭. মাই নেম ইজ সিংঘানিয়া

যা ভাবা যায়, সেটা যখন না হয়–তখন মনের অবস্থাটা আবার স্বাভাবিক হতে বেশ কিছুটা সময় লাগে। সিংঘানিয়ার নামটার সঙ্গে সিংহের মিল আছে বলে বোধহয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কাউকে আশা করেছিলাম। যিনি এলেন তাঁর মাঝারি গড়ন, মেজাজে মাঝারি গাম্ভীর্য্য, গলার স্বর সরুও নয় মোটাও নয়। শুধু একটা মোটা পাকানো গোঁফে বলা যায় কিছুটা ভারিক্কি ভাব এসেছে।

মাই নেম ইজ সিংঘানিয়া বললেন ভদ্রলোক–প্লিজ সিট ডাউন।

আমরা তিনজনে দুটো গদিতে ভাগাভাগি করে বসলাম, সিংঘানিয়া বসলেন তৃতীয় গদিতে সোজা আমাদের দিকে মুখ করে। কথা হল ইংরেজি-হিন্দি মিশিয়ে।

সিংঘানিয়া বললেন, আপনার খ্যাতির সঙ্গে আমি পরিচিত মিঃ মিটার, কিন্তু আলাপ হবার সৌভাগ্য হয়নি।

ফেলুদা বলল, বিপদে না পড়লে তো আর আমার ডাক পড়ে না, তাই আলাপ হবার সুযোগও হয় না।

আমি অবিশ্যি আপনাকে বিপদে পড়ে ডাকিনি।

তা জানি, বলল ফেলুদা।আপনার নামও কিন্তু আমি শুনেছি। অবিশ্যি সিংঘানিয়া তো অনেক আছে, কাজেই যাঁর নাম শুনেছি, তিনিই আপনি কিনা বলতে পারব না।

আই অ্যাম ভেরি ইন্টারেস্টেড টু নো, আপনি কী ভাবে আমার নাম শুনলেন।

আপনি হরিদ্বার গিয়েছিলেন কখনও?

সার্টেনলি।

সেখানে ভবানী উপাধ্যায় বলে একজনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন?

করেছিলাম। বাইকী; কিন্তু আপনি সেটা জানলেন কী করে?

উপাধ্যায়ের বাড়িওয়ালা আমাকে বলেছিলেন যে, মিঃ সিংঘানিয়া এবং আর একজন ভদ্রলোক উপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

আর কিছু বলেননি?

বলেছিলেন যে উপাধ্যায়কে নাকি আপনি লোভে ফেলে দিয়েছিলেন, কিন্তু উপাধ্যায় সেটা কাটিয়ে ওঠে।

হোয়াট এ স্ট্রেঞ্জ ম্যান, দিস উপাধ্যায়! আমি এমন লোক আর দ্বিতীয় দেখিনি। ভেবে দেখুন। মিঃ মিটার-লোকটার রোজগার মাসে পাঁচশো টাকার বেশি নয়, কারণ গরিবদের সে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে। সেই লোককে আমি পাঁচ লাখ টাকা অফার করুলাম। আপনি জানেন বোধহয় যে, ওঁর কাছে একটা অত্যন্ত ভ্যালুয়েব্ল লকেট আছে—খুব সম্ভবত এককালে সেটা ট্র্যাভাঙ্কোরের মহারাজার ছিল।

সে তো জানি, কিন্তু আমার জানার কৌতুহল হচ্ছে, আপনি এই লকেটের খবরটা জানলেন কী করে। ওটা তো রাজার পাঁচ-ছ জন খুব কাছের লোক ছাড়া আর কারও কাছে প্রচার হয়নি।

আমি খবরটা জেনেছিলাম। সেই কাছের লোকেদের একজনের কাছ থেকেই। আমার জুয়েলারির ব্যবসা আছে দিল্লিতে। আমার কাছে এই লকেটের খবর আনে রূপনারায়ণগড়ের ম্যানেজার মিঃ পুরীর ছেলে দেবীশঙ্কর পুরী। সে আমাকে লকেটা কিনতে বলে। ন্যাচারেলি হি এক্সপেক্টেড এ পারসেনটেজ। আমরা গেলাম হরিদ্বার। উপাধ্যায় রিফিউজ করলেন। পুরীর উৎসাহ চলে গেল। কিন্তু আমি ওটা কেনার লোভ ছাড়তে পারছি না। আমার মনে হয়, এখনও চেষ্টা করলে হয়তো পাওয়া যাবে। তখন তিনি ডাক্তারি করছিলেন, লোকের সেবা করছিলেন, এখন হি ইজ এ সন্ন্যাসী। একজন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর ওই রকম একটা পার্থিব সম্পদের উপর কোনও আসক্তি থাকবে, এটা ভাবতে একটু অদ্ভুত লাগছে না? আমি চাই, ওঁকে আর একবার অ্যাপ্রোচ করতে।

বেশ তো, করুন না।

দ্যাট ইজ ইম্পসিবল, মিঃ মিটার।

কেন?

উনি এমন জায়গায় থাকেন, সেখানে আমার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব। আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

করুন।

প্রধানত ভ্রমণের উদ্দেশ্যে। তবে উপাধ্যায় লোকটার উপর আমার একটা শ্রদ্ধা রয়েছে। তার যদি কোনও অনিষ্ট হচ্ছে দেখি, তা হলে কিন্তু আমি বাধা দেব।

ইউ আর অ্যাকটিং অ্যাজ এ ফ্রি এজেন্ট? আপনাকে কেউ এমপ্লয় করেনি?

না।

আপনি আমার হয়ে কাজ করবেন?

কী কাজ?

আপনি উপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে তাকে বুঝিয়ে বলে লকেটটা এনে দিন। আমি আপনাকে পাঁচ লাখের টেন পার্সেন্ট দেব। উনি যদি নিজে টাকা না নেন, তা হলে ওঁর। যদি কোনও উত্তরাধিকারী থাকে, তাকে আমি টাকাটা দেব।

কিন্তু এই লকেট সম্বন্ধে ইন্টারেস্টেড়ি আরও কয়েকজন। এখানে রয়েছে, আপনি জানেন সেটা?

রূপনারায়ণগড়ের ছোটকুমার তো?

আপনি জানেন?

জানতাম না। আজ বিকেলেই ভার্গব বলে এক সাংবাদিক এসেছিল। কেদারে এসেও যে সাংবাদিকদের উৎপাত সহ্য করতে হবে, সেটা ভাবিনি। যাই হাক, সে-ই খবরটা দিল। কিন্তু ছোটকুমার তো ফিল্ম তুলতে এসেছে।

জানি। কিন্তু তাতে উপাধ্যায় আর লকেটের একটা বড় ভূমিকা আছে।

সিংঘানিয়ার চেহারাটা এবার একটা ইঁদুরের মতো হয়ে গেল। সে হাতজোড় করে বলল–

দোহাই মিঃ মিটার—প্লিজ হেল্প মি

আপনি ভার্গবকে এ সব নিয়ে কিছু বলেননি তো?

পাগল! আমি বলেছি তীর্থ করতে এসেছি। কেদারে আসার আর কোনও কারণ থাকার দরকার আছে কি?

ভার্গব লোকটাও উপাধ্যায় সম্বন্ধে ইন্টারেস্টেড; তবে খবরের কাগজের খোরাক হিসেবে।

আপনি কিন্তু এখনও আমার কথার উত্তর দেননি।

মিঃ সিংঘানিয়া–আমি এইটুকু বলতে পারি যে, আপনার প্রস্তাব আমি উপাধ্যায়কে জনাব। তবে আমার ধারণা যে তিনি যদি লকেটটা নিজে না রাখেন, তবে সেটা হয়তো অন্য কাউকে দিয়ে যেতে চাইবেন। কাজেই এখন কোনও পাকাপাকি কথা বলার দরকার নেই; তখন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হবে, কেমন?

ভেরি গুড।

*

বাইরে রাত। কেদার শহর ঝিমিয়ে পড়েছে। বাড়ির বাতি, রাস্তার বাতি, দোকানের বাতি-সবই যেন ধুঁকছে। তারই মধ্যে এক জায়গায় বেশ একটা উজ্জ্বল আলো দেখে অবাক হয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখি, ছোটকুমার পবনদেও একটা

ব্যাটারির আলো জ্বলিয়ে কেদারের গলির ফিল্ম তুলছে। আমাদের দেখে শুটিং থামিয়ে ফেলুদাকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করল, উপাধ্যায়ের কোনও খবর পেলেন?

ফেলুদা উত্তর না দিয়ে একটা পালটা প্রশ্ন করল–

আপনি উঠেছেন কোথায়?

এখানে পাণ্ডারা ঘর ভাড়া দেয়, জানেন তো? তারই একটাতে রয়েছি—এই বাঁয়ের রাস্তা দিয়ে দুটো বাড়ির পরে ডান দিকের বাড়ি।

ঠিক আছে–আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করছি, বলল ফেলুদা। আমরা এগিয়ে গেলাম। আমাদের ধরমশালার দিকে।

লালমোহনবাবু হঠাৎ মন্তব্য করলেন, ছোটকুমার কেমন লোক জানি না মশাই, কিন্তু সিংঘানিয়া লোকটা ধড়িবাজ আছে।

কী করে জানলেন? ফেলুদা প্রশ্ন করল।

আপনি যেখানে বসেছিলেন, সেখান থেকে বোধ হয় দেখতে পাননি, কিন্তু আমি দেখলাম, লোকটার কেটের বাঁ পকেটে একটা ক্যাসেট রেকডার। কথা শুরু হবার আগে সেটা টুক করে চালু করে দিল।

ধড়িবাজের উপর আবার ধড়িবাজতর হয় জানেন তো?

ফেলুদাও তার পকেট থেকে মাইক্রোক্যাসেট রেকর্ডারটা বার করে দেখিয়ে দিল।

আপনি কি ভাবছেন যে, এটা আমি-

ফেলুদার কথা শেষ হল না, কারণ কাঁধে একটা ঘা খেয়ে ততক্ষণে সে মাটিতে পড়ে গেছে। গলির এই অংশটা নিরিবিলি, সেই সুযোগে পাশের কোনও গলি থেকে একটা লোক আচমকা বেরিয়ে এসে ওই কাণ্ডটি করেছে।

মুহূর্তের মধ্যে একটা তুলাকালাম কাণ্ড হয়ে গেল।

লোকটা মেরেই পালাচ্ছিল; আমি তার উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ে তার কোমরটা দু হাতে জাপটে ধরে তাকে দেয়ালে চেপে ধরলাম। সেও পালটা চাপ দিয়ে আমাকে ঠেলে সরিয়ে পালাতে যাচ্ছিল, এমন সময় লালমোহনবাবু তার হাতের অস্ত্রটা দিয়ে তাকে এক ঘায়ে ধরাশায়ী করে দিলেন।

অস্ত্রটা আর কিছুই না, গৌরীকুণ্ডে দুটাকা দিয়ে কেনা সেই লোহা-লাগানো লাঠি। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, লোকটার মাথা ফেটে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে কিন্তু সেই অবস্থাতেই সে আবার উঠে, এক দৌড়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল!

এদিকে ফেলুদা উঠে বসেছে। বাঝাই যাচ্ছে সে বেশ কারু। আমরা দু জন দু দিক থেকে তাকে ধরে তুললাম। আমাদের ধরমশালায় প্রায় পৌঁছে গেছি। শেষ পথটুকু ফেলুদা শুধু একটা কথাই বলল, কেদারেও তাহলে গুণ্ড এসে পৌঁছে গেছে!

কপাল-জোরে আমাদের পাশের ঘরেই একজন বাঙালি ডাক্তার পাওয়া গেল, নাম অধীর সেন। অধীরবাবু আবার ফেলুদাকে চিনে ফেললেন, কাজেই যত না জখম, তার তুলনায় শুশ্রুষাটা একটু বেশিই হল। ডান কাঁধে একটা জায়গায় কেটে গিয়েছিল, সেখানে ওষুধ দিয়ে ব্যান্ড-এন্ড দিয়ে দিলেন। বললেন, ফ্র্যাকচার হয়েছে কি না, সেটা তো এক্স-রে না করলে বোঝা যাবে না!

ফেলুদা বলল, ফ্র্যাকচারই হোক আর যাই হাক, আমাকে বিছানায় শুইয়ে রাখতে পারবেন না, এটা আগে থেকেই বলে দিলাম।

ফি-এর কথা জিজ্ঞেস করাতে ভদ্রলোক জিভ-টিভ কেটে একাক্কার-তবে ব্যাপারটা কী জানেন, মিঃ মিত্তির। এই নিয়ে আমার তিনবার হল কেদার। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেমন ছিল তেমনই আছে, কিন্তু ক্রমে অ্যান্টি-সোশ্যাল এলিমেণ্টস ঢুকে পড়ছে। শহরে। এর জন্য দায়ী কী জানেন তো? আমাদের যানবাহনের সুব্যবস্থা। এক দিকে ভাল করেন তো অন্য দিক দিয়ে খারাপ ঢুকে পড়ে–এই তো দেখে আসছি জগতের নিয়ম।

কালীকমলীর ম্যানেজার নিজের বুদ্ধি খাটিয়েই এখানকার পুলিশকে খবর দিয়ে আনিয়ে নিয়েছিলেন। ফেলুদা তার সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ ধরে কথা বলল। বুঝতে পারলাম যে, নানা রকম নির্দেশ দেওয়া হল, এবং সবই দারোগা সাহেব অতি মনোযোগের সঙ্গে শুনে নিলেন।

পুলিশ চলে যাবার পর সাংবাদিক মিঃ ভার্গব এসে হাজির-শুনলাম আপনার লাইফের উপর একটা অ্যাটেম্পট হয়ে গেছে?

গোয়েন্দার জীবনে এ তো দৈনন্দিন ঘটনা, মিঃ। ভার্গব। এখানকারই কোনও গুণ্ডা হয়তো পকেট মারতে চেয়েছিল, কিন্তু বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি।

আপনি বলতে চান, আপনার কোনও তদন্তের সঙ্গে এর কোনও কানেকশন নেই?

তদন্ত আবার কোথায়? আমি তো এখানে এসেছি উপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে।

ভাল কথা, তিনি কোথায় থাকেন সে খবর পেয়েছেন?

আপনি পেয়েছেন?

উপাধ্যায় বলে এখানে কেউ কাউকে চেনে না।

তা হলে ভদ্রলোক হয়তো নাম বদলেছেন।

তাই হবে।

ফেলুদা আসল ব্যাপারটা বেমালুম চেপে গেল। ভার্গব কিছুটা নিরাশ হয়েই যেন চলে গেলেন।

কাল সকাল সকাল উঠতে হবে বলে আমরা সাড়ে আটটার মধ্যে পুরি-তরকারি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ার আয়োজন করতে লাগলাম। এই সময় ফেলুদা যে ব্যাপারটা করল, সেটা কিন্তু আমি আর লালমোহনবাবু মোটেই অ্যাপ্রভ করতে পারলাম না। ও বলল, তোরা দুজনে শুয়ে পড়, আমি একটু ঘুরে আসছি।

ঘুরে আসছি মানে? আমি অবাক এবং কিছুটা বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলাম। আমি জানি, ওর কাঁধে এখনও বেশ ব্যথা। কোত্থেকে ঘুরে আসছ?

একবার ছোটকুমারের সঙ্গে দেখা করা দরকার।

সে কী, তুমি সোজা এনিমি ক্যাম্পে চলে যাবে?

আমার এ রকম অনেক বার হয়েছে রে তোপ্‌সে। একটা চাট খেয়ে বুদ্ধিটা খুলে গেছে। এবারও তাই। পবনদেও আমাদের শত্রু না।

তবে?

আসল শত্রু কে, সেটা জানতে পারবি খুব শিগগিরই।

কিন্তু তুমি বেরোবে, আর শত্রু যদি এখন ওঁত পেতে থাকে?

আমার সঙ্গে অস্ত্র আছে। তোরা শুয়ে পড়ে। আমি যখনই ফিরি না কেন, কালকের প্রোগ্রামে কোনও চেঞ্জ নেই। গান্ধী সরোবর। ভোর সাড়ে চারটায় রওনা হচ্ছি।

সঙ্গে রিভলভার আর একটা বড় টর্চ নিয়ে ফেলুদা চলে গেল।

তোমার দাদার সাহসের জবাব নেই, বললেন জটায়ু।

০৮. ফেলুদা কাল রাত্তিরে কখন ফিরেছে

ফেলুদা কাল রাত্তিরে কখন ফিরেছে জানি না। সেটা ওকে আর জিজ্ঞেস করলাম না, কারণ ও দেখলাম সাড়ে চারটার মধ্যে রেডি হয়ে আছে।

আমরা দুজনও দশ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নেওয়ার পর তিনজনে এক সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। বাইরে এখন ফিকে ভোরের আলো, রাস্তার বাতিগুলো এখনও টিমটিম করে জ্বলছে।

কেদারনাথের মন্দির ছাড়িয়ে খোলা জায়গায় পড়ে ফেলুদা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, তুই যে জিভ আর দাঁতের ফাঁক দিয়ে খুব জোরে শিস দিতিস, সেটা এখনও পারিস?

আমি একটু অবাক হয়েই বললাম, হ্যাঁ, তা পারি বইকী।

ফেলুদা বলল, আমি যখন বলব, তখন দিবি।

আমরা তিনজনেই সঙ্গে লোহার স্পাইক-দেওয়া লাঠি এনেছিলাম, তা না হলে মাঝে মাঝে বরফে ঢাকা এই পাথুরে পথ দিয়ে হাঁটা অসম্ভব হত। গোড়াতেই মন্দাকিনীর উপর দিয়ে একটা তক্তা-ফেলা সেতু পার হতে হয়েছে আমাদের। নদী এখানে সরু নালার মতো। তিন দিকে ঘিরে যে সব তুষার-শৃঙ্গ রয়েছে, তার কোনওটার নাম এখনও জানা হয়নি। তাদের মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে উঁচু, তার চূড়োয় গোলাপি আভা লক্ষ করা যাচ্ছে। শীত প্রচণ্ড, তারই মধ্যে কাঁপা গলায় লালমোহনবাবু হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, তো-হা-হাপসে তো শি-হিস দেবে; আমার ভূ-হূ-হূমিকাটা—?

ফেলুদা বলল, আপনি আপনার ওই হাতের লাঠিটা প্রয়োজনে পাগলা জগাই-এর মতো মাথার ওপর ঘোরাবেন, তাতে আপনার বীরত্ব আর ব্যারাম দুটোই একসঙ্গে প্রমাণ হবে।

বু-হু-ঝেছি।

আরও আধঘণ্টা চলার পরে দেখতে পেলাম, দূরে একটা ছাই রঙের মসৃণ সমতল প্রান্তর রয়েছে। চারিদিকের পাথরের মধ্যে সেটাই যে চোরাবালিতাল বা গান্ধী সরোবর, সেটা বুঝতে অসুবিধা হল না। তবু আমি ফেলুদার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ওটাই কি–? ফেলুদা ঘাড় নাড়িয়ে বুঝিয়ে দিল, হ্যাঁ।

হ্রদের পশ্চিম ধারে একটা পাথরের টিবি রয়েছে, সেটার মধ্যে অনায়াসে একটা গুহা। থাকতে পারে। পুরো ব্যাপারটা এখনও আমাদের থেকে অন্তত আড়াইশো গজ দূরে।

আমরা যেখান দিয়ে যাচ্ছি সেখানে জমিতে আলগা পাথর ছাড়াও বেশ বড় বড় শিলাখণ্ড রয়েছে। তা ছাড়া বরফ জমে রয়েছে চতুর্দিকে।

কিছুক্ষণ থেকেই লক্ষ করছি যে ফেলুদার দৃষ্টিটা এদিক ওদিক ঘুরছে ও যেন কিছু একটা খুঁজছে। এবারে দৃষ্টিটা এক জায়গায় স্থির হল।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম আমাদের ডান দিকে একটা পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে আছে ক্যামেরার তেপায়ার একটা ঠ্যাং।

ফেলুদা প্রায় নিঃশব্দে সেই দিকে এগিয়ে গেল, আমরা তার পিছনে।

পাথরটা পেরোতেই দেখা গেল ছোটকুমার পবনদেও ক্যামেরায় চোখ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লেনাসটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, সেটা টেলি-ফোটা, অর্থাৎ–টেলিস্কোপের কাজ করবে।

ছোটকুমারের পাশে পৌঁছতেই তিনি বললেন, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে গুহাটা, কিন্তু এখনও উনি বেরোননি।

এবার পর পর ফেলুদা আর আমি দুজনেই চোখ লাগালাম।

লেকের জলটা স্থির, তাতে আকাশের আবছা গোলাপি রং প্রতিফলিত হয়েছে। তারপর বাঁ দিকে ক্যামেরা ঘুরিয়ে দেখা গেল। গুহাটা। পাথরের ফাঁকে গোঁজা একটা গৈরিক পতাকা রয়েছে গুহাটার ঠিক পাশে।

আমাদের চারপাশের যে শৃঙ্গগুলো সবচেয়ে উঁচু, তাতে এখনই গোলাপি রোদ লেগেছে। পুবে একটা উঁচু শৃঙ্গ, তার পিছনে আকাশের লাল রং দেখে মনে হচ্ছে সূর্যটা ওখান দিয়েই উঠবে।

মিনিটখানেকের মধ্যেই পুবের পাহাড়ের চূড়ের পিছন দিয়ে চোখ-ঝলসানো সূর্যটা উঁকি দিতেই গান্ধী সরোবরট রোদে ধুয়ে গেল।

সেই সঙ্গে লক্ষ করলাম, গুহার গায়ে রোদ পড়েছে আর এক আশ্চর্য প্রাকৃতিক পরিবেশে এক আশ্চর্য নাটক হচ্ছে এইভাবে এক সন্ন্যাসী বেরিয়ে এলেন গুহা থেকে। তাঁর দৃষ্টি সোজা পুর্ব দিকে। যেন নতুন-ওঠা সূর্যকে স্বাগত জানাচ্ছেন।

তোপ্‌সে, এগিয়ে চল! ফিসফিসিয়ে আদেশ এল ফেলুদার কাছ থেকে।

আমি ক্যামেরায় আছি, বললেন ছোটকুমার।

আমরা তিনজন দ্রুত এগিয়ে গেলাম গুহার দিকে এ-পাথর ও-পাথরের আড়াল দিয়ে। আলো পড়ছে, কিন্তু কোনও শব্দ নেই। প্রকৃতি যেন রুদ্ধশ্বাসে কোনও একটা বিশেষ ঘটনার জন্য অপেক্ষা করছে।

এবার গুহা, সন্ন্যাসী, পতাকা সবই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আমরা উত্তর-মুখে এগিয়ে চলেছি। সন্ন্যাসী আমাদের দিকে পাশ করে পূর্ব দিকে চেয়ে আছেন, তাঁর গেরুয়া বসনের উপর একটা খয়েরি রঙের পট্টুর চাদর।

এবার একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ করলাম। গুহার পুব দিকের পাথরের টিবির গায়ে একটা আলো নড়া চড়া করছে। সেটা যে কোনও ধাতব জিনিস থেকে প্রতিফলিত, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

এবার গুহার টিবির পিছন দিয়ে একটা লোক বেরিয়ে এল। তার ওভারকেটের কলার তোলা, তাই মুখটা বোঝা যাচ্ছে না। লোকটার মাথায় একটা পশমের টুপি, আর হাতে যে জিনিসটা রোদ পড়ে চক্‌চক্‌ করছে, সেটা রিভলভার ছাড়া আর কিছুই না।

সন্ন্যাসী সেই একই ভাবে সামনের দিকে চেয়ে আছেন, সূর্যের আলো পড়ছে তার মুখে।

ফেলুদা এবার চাপা গলায় বলল, আমি এগোচ্ছি। তোরা এই পাথরের আড়াল থেকে দ্যাখ; রিভলভারের আওয়াজ শুনলেই তোর সেই শিসটা দিবি।

ফেলুদা নিঃশব্দে এগিয়ে গেল। গুহাটার দিকে। খানিক দূর গিয়ে সে একটা পাথরের পাশে এমনভাবে দাঁড়াল যে সমস্ত ঘটনাটা দেখতে পায়। আমরা আছি তার বিশ গজ পিছনে, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি নাটকের সব চরিত্রকে।

ফেলুদার পকেট থেকেও এবার রিভলভার বেরিয়ে এল।

এবার সন্ন্যাসী তাঁর দৃষ্টি ঘুরিয়েছেন বাঁ দিকে, অর্থাৎ ওভারকেটে মুখ-ঢাকা লোকটার দিকে।

পরমুহূর্তেই এই অপার্থিব নৈঃশব্দ্য চুরমার করে একটা রিভলভারের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ওভারকেট পরা লোকটা বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের কবজি টিপে বরফের উপর বসে পড়ল, আর তার হাতের রিভলভারটাও ছিটুকে গিয়ে পড়ল বরফের উপর।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ল ফেলুদার নির্দেশ।

শিসের শব্দ হওয়া মাত্র এ-পাথর সে-পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল পুলিশ।

তোপ্‌সে, তোরা আয়।

আমরা দুজনে দৌড়ে এগিয়ে গেলাম ঘটনাস্থলের দিকে।

এক মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেলাম সাধুর গুহার সামনে।

সৌম্যমূর্তি গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী এখনও যেন পুরো ব্যাপারটা অনুধাবন করতে পারেননি। আমাদের সকলের দিকেই ঘুরে ঘুরে অবাক হয়ে দেখছেন।

আর যিনি মাটিতে বসে আছেন তাঁর কবজি টিপে? এবারে তো তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছে।

সে কী, ইনি যে সাংবাদিক মিঃ। ভার্গব!

একজন কনস্টেবল যেন ফেলুদারই কাছ থেকে নির্দেশ পাবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। ফেলুদা বলল, আগে ওঁর দাড়িটা টেনে খুলুন তো!

ভার্গবের দাড়িটা টেনে খুলতে যে মুখটা বেরোল, সেই মুখটাই ম্যাজিকের মতো আশ্চর্য রকম চেনা চেনা হয়ে গেল—যখন ফেলুদা নিজেই গিয়ে এক টানে মাথার টুপিটা খুলে ফেলল।

আশ্চর্য জিনিস রে হেরেডিটি, বলল ফেলুদা—শুধু যে এর কানের লতি এর বাপের মতো, তা নয়, ইনি সিঁথিও করেন ডান দিকে-আর তাই একে দেখে আমার এত আসোয়াস্তি হত।

তার মানে কী দাঁড়াল?

ইনি উমাশঙ্কর পুরীর ছেলে দেবীশঙ্কর পুরী।

০৯. দৃষ্টি গেল সন্ন্যাসীর দিকে

এবার আমাদের সকলের দৃষ্টি গেল সন্ন্যাসীর দিকে। তাঁর এখনও কেমন যেন মুহ্যমান ভাব। হিন্দিতে বললেন, পিস্তলের শব্দ শুনে মনটা কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল—কিছু মনে করবেন না।

ফেলুদাও হিন্দিতে বলল, যদি কিছু মনে না করেন, আপনার কাছে যে থলিটি আছে, সেটি একবার বার করা দরকার। আমরা আপনার বন্ধু, সেটা বোধহয় বুঝতেই পারছেন। ওটা আপনার গুহার মধ্যেই আছে তো?

আর কোথায় থাকবে? ওই তো আমার একমাত্র সম্পত্তি!

একজন কনস্টেবল গিয়ে গুহার ভিতর থেকে একটা লাল থলি বার করে নিয়ে এল। সেটা খুলতে প্রথমে বেরোল একটা পাকানো কাগজ। এটা রাজা চন্দ্রদেও সিং-এর সিলমোহর সমেত ভবানী উপাধ্যায়কে লকেট-দানের স্বীকৃতি।

তারপর বেরোল আরেকটা ছোট থলি থেকে সেই বিখ্যাত সোনার লকেট—বালগোপাল—যার অপরূপ সৌন্দর্য এই পরিবেশে, এই সকালের রোদে আরও শতগুণ বেড়ে গেছে।

এইবার ফেলুদা মুখ খুলল। তার বেস্ট হিন্দিতে সে বলল, এবার আপনার আসল পরিচয়টা দিলে কিন্তু আমাদের সকলের খুব সুবিধে হত।

আমার আসল পরিচয়।

আপনার নিজের নামটা বাংলাতেই বলুন না। অ্যাদ্দিন পরে বাংলা বলতে আপনার নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।

উপাধ্যায় ফেলুদার দিকে অবাক হয়ে গিয়ে বাংলায় বললেন, আপনি বুঝে ফেলেছেন আমি বাঙালি?

কেন বুঝব না? বলল ফেলুদা, আপনি দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দিতে চিঠি লিখেছেন, কিন্তু আপনার ল আর বর্গীয় জ বাংলার মতো। তা ছাড়া আপনার হরিদ্বারের ঘরের তাকে একটা বইয়ের পাতার টুকরো পেয়েছি, সেটাও বাংলা।

আপনার বুদ্ধি তো আশ্চর্য তীক্ষ্ণ?

এবার আর একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন কি?

কী?

উপাধ্যায় কি সত্যিই আপনার পদবি, আর ভবানী কি সত্যিই আপনার নাম?

আপনি কী বলছেন আমি—

উপাধ্যায় কি গঙ্গোপাধ্যায়ের অংশ নয়, আর ভবানী কি দুগার আরেকটা নাম নয়? আমি যদি বলি, আপনার আসল নাম দুগামোহন গঙ্গোপাধ্যায়—তাহলে কি খুব মিথ্যে বলা হবে?

ছো—ছো-ছো-ছো—

আপনি কাকে ধিক্কার দিচ্ছেন। লালমোহনবাবু? ফেলুদা বলে উঠল।

ছো-ছোটকাকা।

দুগামোহন গঙ্গোপাধ্যায় অবাক হয়ে চাইলেন লালমোহনবাবুর দিকে।

আমি যে লালু! বললেন জটায়ু।

লালমোহনবাবু গিয়ে দুগামোহনকে টিপ করে প্রণাম করায় সাধুবাবা তাঁর ভাইপোকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তা হলে তো আমার সমস্যার সমাধান হয়েই গেল। ওই লকেট তো তোরই প্রাপ্য! ও জিনিস আমার কাছে রাখা এক বিরাট বিড়ম্বনা।

তা তো বটেই। তা, আমাকে দিলে আমি একটা ব্যাঙ্কের ভল্টে রেখে দিতে পারি। আপনি তো জানেন না ছোটকাকা, আজকাল আমি ছোটদের উপন্যাস লিখে বেশ টু পাইস করছি; তবে রুচির তো কিছু বলা যায় না, এক'দিন দেখব ঝাঁপ করে সেল পড়ে গেছে! তখন লকেটটা থাকলে তবু একটা...

*

নিজের ছেলে লকেটটা হাত করার তাল করছে জেনে উমাশঙ্করকে বাধ্য হয়ে ফেলুদাকে টেলিগ্রাম ও চিঠি পাঠাতে হয়েছিল। বাপকে হাতের মুঠোর মধ্যে রাখার ক্ষমতা দেবীশঙ্করের নিশ্চয়ই আছে। দুর্গমোহন খুন হলে লকেট বেহাত হয়ে যেত এটাও ঠিক, কিন্তু বাঁচিয়ে দিয়েছিল ওই ধস। দেবীশঙ্কর আটকা পড়ে গিয়েছিল রুদ্রপ্রয়াগে। সিংঘানিয়া যে এসেছিল কেদারে, সে একেবারে নিজের গরজে, লকেটটাকে কেনার জন্য।

দেবীশঙ্করই লোক লাগিয়ে ফেলুদার দিকে পাথর গড়িয়ে দিয়েছিল, সে-ই আবার কেদারে রাত্তির বেলা গুণ্ডা লাগিয়ে ফেলুদাকে জখম করার চেষ্টা করেছিল।

ছোটকুমার পবনদেও সিং অবিশ্যি তার ক্যামেরা দিয়ে পুরো ঘটনাই টেলি-ফোটা লেনাস-এর জোরে বেশ কাছ থেকেই তুলে রেখেছিল। দেবীশঙ্কর যে রিভলভার বার করে দুগামোহনের দিকে তাগ করেছিল, সেটা স্পষ্ট বোঝা যাবার কথা। আপাতত ছোটকুমারের আর ফিল্ম নেই, কিন্তু দিল্লি থেকে স্টক এলে পরে দুর্গমোহনের একটা সাক্ষাৎকার নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করল। দুগামোহন আপত্তি করলেন না; বরং বললেন, একজন রাজার আশ্চর্য দরাজ মনের কথাটা বিশ্বের লোকের কাছে গোপন থাকে কেন? আমি টেলিভিশন ক্যামেরায় নিশ্চয়ই বলব আমার সোনার বালগোপাল, পাবার কথা।

পবনদেও বললেন, কিন্তু বালগোপাল তো আর আপনার কাছে থাকছে না।

না, বললেন দুর্গমোহন। সেটার ছবি যদি তুলতে চাও তা আমার ভাইপাকে বলো।

পবনদেও লালমোহনবাবুর দিকে ফিরে বললেন, আপনার বাড়ি গিয়ে আমি লকেটটার ছবি তুলে আনতে পারি কি?

জটায়ু তাঁর সবচেয়ে বেশি সাহেবি উচ্চারণে বললেন, ইউ আর মোউস্ট ওয়েলখাম?